KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৮ সারকাস মার্কেট প্লেস, কল- ১৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমীরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 9/4 10/4 11/1 11/2	Year of Publication : Oct 1986 July - Sep 87 Feb 1988 June 1988 Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমীরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

৩৪

সম্পাদক / সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বিভাব

বিভাব

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
১৩৯৩ শরৎ

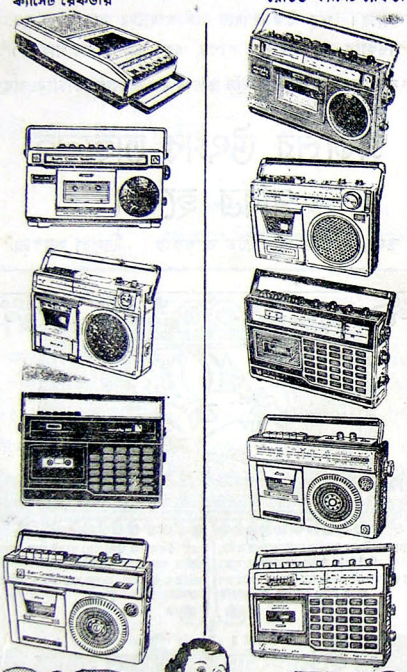

কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সূচি

পুনর্মুদ্রণ

কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ১

প্রবন্ধ

গোত্রান্তরের গল্পকার সুবোধ ঘোষ। অলোক রায় ৪১

স্রষ্টা, তাঁর নির্মাণ তাঁর নির্বাণ। দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক ১০৪

কবিতা

এবার ফল্গু। লোকনাথ ভট্টাচার্য ৪৯

আলোচনা

ভাষাচিন্তা—সূত্র : রবীন্দ্রনাথ। পিনাকী ভাদুড়ী ৬২

গল্প

ভবিতব্যের গল্প (উদাচী গোষ্ঠ)। শঙ্করনারায়ণ নবরে ৭৮
অনুবাদ : ঝরা বসু ও উষা চাকী

ঘুম। বিজনকুমার ঘোষ ৯১

সম্পাদকমণ্ডলী
পবিত্র সরকার
দেবীপ্রসাদ মজুমদার। প্রদীপ দাশগুপ্ত

সম্পাদক
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদকীয় দপ্তর
6 সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলিকাতা 17

প্রচ্ছদ
শঙ্কর ঘোষ। অনুপ রায়

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক 6 সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলিকাতা 17 থেকে প্রকাশিত ও প্রিন্টেক, 2 গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলিকাতা 4 থেকে মুদ্রিত।

কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সুকুমার রায় ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের তরুণ সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথকে সংবিধান অনুযায়ী সমাজের সম্মানিত সভ্য নির্বাচনের উদ্যোগ করলে তৎকালীন সমাজ-কর্তৃপক্ষ বিরোধিতা করেন। বিরোধ শেষ পর্যন্ত ১৯২১-এর মার্চ মাসে গণভোটে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ৪৯৬ ও বিপক্ষে ২৩২ সমর্থনে নিষ্পন্ন হয়। নির্বাচন উপলক্ষে প্রশান্তচন্দ্র রচনা করেন এই পুস্তিকা : 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই'। বলা বাহুল্য, এই রবীন্দ্র-বিরোধিতাকে কেবলমাত্র ব্রাহ্মসমাজের অন্তঃকলহ ভাবলে ভুল হবে, তৎ-কালীন বাঙালি সমাজের এবং নবীন-প্রবীণের আবহমান সংঘাতেরও ইঙ্গিত আছে এ বিরোধে।

অধ্যাপক স্বপন মজুমদার তাঁর সংগ্রহ থেকে আমাদের পুস্তিকাটি ব্যবহার করতে দিয়ে বাধিত করেছেন। পুনর্মুদ্রণকালে বানানে দ্বিত্ব বর্জিত হয়েছে এবং অসমতা যথাসম্ভব দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই

নিবেদন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্যরূপে নির্বাচন করিবার প্রস্তাব উপলক্ষে সমাজের মধ্যে একটি আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আলোচনার ফলে যাহা সত্য তাহা সম্পূর্ণ-ভাবে প্রকাশিত হউক, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য।

সমাজের অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এই আলোচনায় সাক্ষাৎ ও প্রকাশ্য ভাবে অথবা ব্যক্তিগত ও পরোক্ষভাবে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহারা সমাজের প্রাচীন নেতা ; সকলেই তাঁহাদিগকে জানে, সকলেই তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করে ; সকলেই তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করে। তাঁহাদের সকলের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে আলোচনা ক্ষেত্রে তাঁহারা facts-এর সম্মুখে facts, প্রমাণের সম্মুখে প্রমাণ, ও যুক্তির সম্মুখে যুক্তি উপস্থিত করিলে সত্য অবশ্যই জয়যুক্ত হইবে। Factsএর বদলে তাঁহাদের উক্তি, প্রমাণের বদলে তাঁহাদের প্রতিপত্তি, ও যুক্তির বদলে তাঁহাদের নাম উপস্থিত করিয়া কোনো লাভ নাই।

আমরা সমাজের অতি সামান্য ও নগণ্য সভ্য মাত্র। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণের নামের জোরে আমাদের কথা চাপা পড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ফল যাহাই হউক, সত্যের উপর ভরসা রাখিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি।

(২)

বর্তমান আলোচনা বর্তমান রবীন্দ্রনাথকে লইয়া

প্রথমে একটি কথা বলিয়া লই। বর্তমান রবীন্দ্রনাথকেই সম্মানিত সভ্য করিবার প্রস্তাব হইয়াছে ; বর্তমান কালে তাঁহার মতামত কিরূপ তাহাই আমাদের প্রধান বিবেচ্য।*

* কেহ যেন মনে না করেন যে পূর্বেকার কথায় আপত্তিযোগ্য কিছু আছে। আমরা যতদূর জানি তাহাতে রবীন্দ্রনাথের কোনো বয়সের কোনো রচনা বা

মানুষের জীবনে সমগ্রতার একটি ঐক্য আছে, চল্লিশ বৎসর পূর্বের কথাকেও বর্তমান কালের সহিত মিলাইয়া দেখা আবশ্যক। সুদূর অতীতকালের কোনো একটি খুঁটিনাটি ঘটনা বা কোনো একটি বিশেষ উক্তিকে, সমস্ত জীবনের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ও চরম সার্থকতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা সম্পূর্ণ দেখা নহে; এই দেখা শুধু যে আংশিক তাহা নহে, খণ্ডিত আকারের মধ্যে ইহা একান্তভাবে মিথ্যারূপেই দেখা।

গত কুড়ি বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ, ধর্ম, সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ ও অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। বর্তমানকালকে ডিঙাইয়া, গত কুড়ি বৎসরের কথা সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়া, শুধু পুরানো কথা আলোচনা করিয়া লাভ নাই। সেই জন্য আমাদের বিনীত অনুরোধ এই যে বর্তমান আলোচনা বর্তমানকালকে লইয়াই করা হউক।

প্রামাণ্য মতামত

আরেকটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথের মতামত আলোচনা করিবার জন্য যথেষ্ট প্রামাণ্য সামগ্রী রহিয়াছে। গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত ইংরাজি ও বাংলা গ্রন্থের সংখ্যা ৬০।৭০ খানির কম হইবে না। ইহা ব্যতীত অনেক প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র নানা মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে এই সকল প্রামাণ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হইতে মতামতের বিচার করুন, অপরের নিকট শোনা কথা লইয়া বাদবিতণ্ডা করিবার আবশ্যকতা নাই।

ব্রাহ্মসমাজে সার্বভৌমিকতা ও জাতীয় ভাব

একটা কথা উঠিয়াছে যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে "অনারারি" সভ্য গ্রহণ করিলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সার্বভৌমিকতা নষ্ট হইয়া যাইবে, কারণ রবিবাবু হিন্দু ভাবাপন্ন, তিনি আপনাকে "আমি হিন্দু নই" বলিয়া পরিচয় দিতে প্রস্তুত নহেন।

কোনো মতামতের মধ্যে এমন কিছু ছিল না যাহাতে তাঁহাকে সম্মানিত সভ্য করা সম্বন্ধে কোনো অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে। তথাপি একথা সত্য যে বর্তমান আলোচনা বর্তমান মতামত লইয়াই হওয়া উচিত।

এ বিষয় কিছু বলিবার পূর্বে কয়েকজন প্রসিদ্ধ নেতার মতামত সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক।

রাজা রামমোহন রায়

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রাজার জীবনচরিতে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।[১]

"রামমোহন রায় (ব্রাহ্ম) সমাজকে বিশেষরূপে হিন্দু আকার দিয়াছিলেন। ...ট্রষ্টডীডপত্রের অসাম্প্রদায়িক উদারভাব, এবং ঐরূপ হিন্দুভাবের মধ্যে সঙ্গতি আছে কিনা, ইহাই বিবেচনার বিষয়।... সত্য মাত্রেই অসাম্প্রদায়িক ও উদার।... কিন্তু সত্যকে কার্যে পরিণত করিতে হইলে ও সত্য প্রচার বিষয়ে প্রত্যেক জাতি তাঁহাদিগের জাতীয় ভাব ও রুচি অনুসারে বিভিন্নপ্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন। কোনো ধর্মসম্প্রদায় দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করেন কোনো ধর্মসম্প্রদায় বসিয়া প্রার্থনা করেন এবং কোনো ধর্মসম্প্রদায় একবার দাঁড়াইয়া ও একবার বসিয়া প্রার্থনা করেন। সার্বভৌমিকতা রক্ষা করিতে হইবে বলিয়া কি এই তিন প্রকারেই প্রার্থনা করিতে হইবে? ইহার তুল্য অসম্ভব ও হাস্যের কথা আর কি আছে? জাতীয় ভাব অবলম্বন করাতে কেবল দোষ নাই, এরূপ নহে, ঐরূপ করাই কর্তব্য। নতুবা প্রচার বিষয়ে কৃতকার্য হওয়া সুকঠিন, সমগ্র জগতের ইতিহাস একথার যাথার্থ্য পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে"।

"তবে রামমোহন রায়ের দোষ কোথায়? সমাজে যে হিন্দু প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা ট্রষ্টডীড-পত্রের কোন্ কথার বিরুদ্ধ? এ পর্যন্ত কেহ তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।... সুতরাং রাজার প্রণালী অনুসারে জাতীয় ভাবে সার্বভৌমিক, কিংবা সার্বভৌমিকভাবে জাতীয় হওয়া আবশ্যক।

...রাজা জাতীয়ভাবে ধর্মসংস্কারকার্য করিয়া গিয়াছেন।[২]

স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন :—

"The sum total of the Raja's teachings...One True God is the universal element in all religions... but the practical appli-

১ "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত"—৪র্থ সংস্করণ; ৩১৩ পৃঃ, ৬২০ পৃঃ, ৬২৬ পৃঃ

২ ৬২৬—৭২৮ পৃঃ। সমস্ত আলোচনাটি উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই; কিন্তু ইহা সকলেরই পড়িয়া দেখা উচিত।

cations of that universal religions are to be always *local* and *national*, a position to which the Brahmo Samaj is still true and faithful."*[১]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শাস্ত্রী মহাশয় :—

"Devendranath who has justly acquired the title of Maharshi, a great seer, from his countrymen, was essentially a Hindu in all his spiritual aims and aspirations. He ever remained so."*[২]

পরলোকগত বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্তী মহর্ষির জাতীয় ভাব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই।†

মহর্ষির নিজের উক্তি উদ্ধার করিয়া ক্ষান্ত হইলাম :—

"...প্রত্যুত একেশ্বরবাদই হিন্দুধর্মের উৎকৃষ্ট অংশ ও হিন্দু শাস্ত্রানুসারে তাহা হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধ মত। হিন্দুধর্মের সেই একেশ্বরবাদই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম। একেশ্বরপ্রতিপাদক ধর্মে নানা দেবদেবীর উপাসনাত্মক কনিষ্ঠ ধর্ম হইতে মহান্ প্রভেদ প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই আমরা ব্রাহ্মধর্ম এই নাম মনোনীত করিয়া লইয়াছি।... যদিও ব্রাহ্মধর্মে এরূপ উদারতা আছে যে, ইহা জাতিবিশেষ কখনই আবদ্ধ হইয়া থাকিবে না; তথাপি হিন্দু জাতির সহিত ইহার সবিশেষ সম্বন্ধ চিরকালই বিদ্যমান থাকিবে।"‡

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মহর্ষিকে "অনারারি" সভ্যরূপে গ্রহণ করিয়া ছিলেন, ইহা স্মরণ করাইয়া দিবার আবশ্যকতা নাই।§

* *History of the Brahmo Samaj*, vol. I (১) p. 79, (২) p. 187.

† মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনচরিতের খসড়া' অধ্যায় ঘ—৬ পৃঃ, ক—৮ পৃঃ, দ্বিতীয় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ, ৫২০—৫২৭ পৃঃ, ২য় খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ ৪৯৯—৫৩০ পৃঃ।

‡ "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর", ৪২১ পৃঃ।

§ সম্মানিত সভ্য বিষয়ক নিয়মটি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম নিয়মাবলী প্রণয়নের দিনই (১৮৭৮ খৃঃ) লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। মহর্ষিকে সম্মানিত সভ্য নির্বাচন করা হয় ইহার দুই বৎসর পরে, অতএব মহর্ষির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইল এরূপ কোনো প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না।

রাজনারায়ণ বসু

"আমি আপনাকে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের সমুন্নত আকার মনে করি"। (আত্মচরিত ৮৬ পৃঃ)

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার "হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা" বিষয়ক বক্তৃতায় এই কথাই আলোচনা করিয়াছেন।

"Brahmic Questions of the Day"তে লিখিয়াছেন :—

"Brahmoism is both universal religion and a form of Hinduism. It wears a two-fold aspect—that of universal religion to all nations, and that of Hinduism to Hindus."

শিবনাথ শাস্ত্রী

Mission of the Brahmo Samaj—p. 25 "...we mild, contemplative *Hindus of India*,...will perhaps still continue to be contemplative and see the Supreme as Soul of our souls..."

"The truth of the whole thing is this. The Theism of the Theistic Church of India is not *un*-Hindu..." (৯২ পৃঃ)

উপসংহারে স্পষ্ট করিয়া তাঁহার আদর্শ কি তাহা বলিয়াছেন :—

"In conclusion, I have only to re-state my ideal of the probable future of the Theistic Church as spreading itself over the world. There will be endless differences in the names and designations of the churches or congregations... the forms of service and ritual, and of domestic and social ceremonies will also be widely different, each body sticking, in that respect, to its *national and traditional inheritance*. (১০৭ পৃঃ)

শাস্ত্রীমহাশয় আরও অনেক স্থলে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে রামমোহনের জাতীয় ভাবে সার্বভৌমিক অথবা সার্বভৌমিক ভাবে জাতীয় হওয়ার আদর্শই ব্রাহ্মসমাজের মূল আদর্শ।

"...though the fundamental principles were natural and universal the forms should be *local and national*." (৮৯ পৃঃ)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আরও কয়েকজনের মত

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন জীবিত শ্রদ্ধেয় নেতার মতও সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, তাঁহার *Philosophy of Brahmoism* (৭১ পৃঃ) লিখিয়াছেন :—"As *Hindu Theists*, the spiritual children and successors of the Rishis, the *Upanishads* and the whole body of *Hindu sastras* expounding, amplifying or correcting their teachings, *are our sastras in a special sense.*"

দেড় বৎসর পূর্বে লিখিয়াছেন :—"আমি ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের বাহিরে বলিয়া মনে করি না, এ'কে নব্যতন্ত্রের হিন্দুসমাজ বলেই মনে করি"।*

শ্রদ্ধেয় সীতানাথ বাবু অল্পদিন পূর্বে একটি প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—

"শুধু ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিলে যথেষ্ট হয় না। আমি ব্রাহ্ম এই সঙ্গে সঙ্গেই বলা আবশ্যক যে আমি হিন্দু।"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জীবিত সভ্যদিগের মধ্যে আচার্য পি, কে, রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হীরালাল হালদার, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি অনেকেরই এই মত।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তিনি "প্রবাসী" পত্রে "ব্রাহ্ম হিন্দু কি অহিন্দু" নামক একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।* তিনি বলেন "তবেই হইতেছে যে হিন্দু শব্দটা কেবল দেশ হিসাবেই ভাববাচক (অর্থাৎ conveying a positive meaning); তা বই ধর্ম বা জাতি হিসাবে তাহা অভাববাচক (অর্থাৎ conveying a negative meaning)…(১৪৮ পৃঃ) আমাকেও যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর তুমি কোন ধর্মাবলম্বী তবে আমিও বলিব না আমি হিন্দু-ব্রাহ্ম; বলিব শুধু আমি ব্রাহ্ম। কোনো বৈষ্ণবকে যদি জিজ্ঞাসা কর তুমি কোন্ ধর্মাবলম্বী, তিনিও বলিবেন না

* "তত্ত্ব-কৌমুদী", ১৩২৫, ১৮৬ পৃষ্ঠা।

* "প্রবাসী", জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

আমি হিন্দু বৈষ্ণব; বলিবেন শুধু আমি বৈষ্ণব।… অশ্ব বলিলেই যেমন চতুষ্পদ অশ্ব বুঝায়, তেমনি বৈষ্ণব বলিলেই হিন্দু-বৈষ্ণব বুঝায়।"

শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রবাবুর মতে ব্রাহ্ম বলিলেই আমাদের দেশে হিন্দু-ব্রাহ্ম বুঝায়। (১৫৫ পৃঃ) "হিন্দু শব্দের সর্ববাদীসম্মত প্রচলিত অর্থের বিরুদ্ধে তাহার একটা নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া আমরা যদি আমাদের সেই ঘরগড়া অর্থে বলি যে, 'আমরা হিন্দু নহি' তবে আমাদের সে কথা মিথ্যা কথারই আর এক নাম হইয়া দাঁড়াইবে।"

দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেন :—"একজন মুসলমান যদি ব্রাহ্ম হয় তবে কি তাহাকে হিন্দু বলা সঙ্গত হইবে? খুবই সঙ্গত হইবে যদি মুসলমানটি পাবনা জেলার মুসলমানদিগের ন্যায় এ দেশী মুসলমান হয়।"

মোট কথা এই যে জাতিবাচক হিন্দু শব্দটি ব্রাহ্ম শব্দের অবিরোধী। রবিবাবুও তাহাই বলেন।

রবীন্দ্রনাথের "আত্মপরিচয়"

আট বৎসর পূর্বে "আত্মপরিচয়" নামক প্রবন্ধে রবিবাবু এসম্বন্ধে নিজেই আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পঠিত হয় এবং এখন "পরিচয়" নামক পুস্তকটির মধ্যে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিলেই রবিবাবুর মতামতের জন্য শোনা কথার উপর নির্ভর করিবার আবশ্যক হইবে না। তাঁহার মতে :—

"এ সম্বন্ধে ভাবিবার কথা এই যে, হিন্দু বলিলে আমি আমার যে পরিচয় দিই, ব্রাহ্ম বলিলে সম্পূর্ণ তাহার অনুরূপ পরিচয় দেওয়া হয় না, সুতরাং একটি আর একটির স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। যদি কাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় তুমি কি চৌধুরীবংশীয়, আর সে যদি তাহার উত্তর দেয়, না আমি দপ্তরীর কাজ করি তবে প্রশ্নোত্তরের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয় না।" (৫৭ পৃঃ)

আমি ব্রাহ্ম হইলেও যেমন আমি বাঙ্গালি একথা সত্য, তেমনি আমি ব্রাহ্ম হইয়াও আমি হিন্দু এ কথা সমান সত্য। রবিবাবু স্পষ্ট বলিয়াছেন (৫৯ পৃঃ) "তবে কি মুসলমান অথবা খৃষ্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াও তুমি হিন্দু থাকিতে পার? নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্কমাত্রই নাই।… ইহা সত্য যে কালীচরণ বাঁড়ুয্যে মশায় হিন্দু খৃষ্টান ছিলেন, তাঁহার পূর্বে গোপেন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দু খৃষ্টান ছিলেন, তাঁহারও পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু খৃষ্টান ছিলেন।

অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খৃষ্টান।··· বাংলা দেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে··· তাহারা প্রকৃতই হিন্দু মুসলমান।··· হিন্দু শব্দ ও মুসলমান শব্দ একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম।··· মত পরিবর্তন হইলে জাতির পরিবর্তন হয় না।"

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়ত্বের আদর্শ তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন :—

"এই কথা উপলব্ধি করিব যে স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে ও সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়—এইকথা নিশ্চিতরূপে বুঝিব যে আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুক্ষিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।"[১]

রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমিকতা

যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের লেখার সহিত কিছুমাত্র পরিচিত আছেন, তাঁহারা জানেন যে রবীন্দ্রনাথ চিরজীবন সার্বভৌমিকতার আদর্শকেই প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত লেখার মধ্যেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করিতেছি :—

পথ ও পাথেয় (রাজা প্রজা, ১১৬-১৩৯ পৃঃ) সমস্যা (রাজা প্রজা, ১৫০, ১৫৯-১৬২ পৃঃ) সাকার ও নিরাকার (আধুনিক সাহিত্য, ১৫৩ পৃঃ) ধম্মপদং (প্রাচীন সাহিত্য, ৭৬ পৃঃ) পাবনার অভিভাষণ (স্বদেশী সমাজ, ৭৩ পৃঃ) ধর্মের সরল আদর্শ (ধর্ম), প্রাচীন ভারতে একঃ (ধর্ম), ততঃ কিম্ (ধর্ম), ধর্মের অর্থ (সঞ্চয়, ৪০, ৫৮ পৃঃ), ধর্ম শিক্ষা (সঞ্চয়, ৬৮ পৃঃ), পার্থক্য (শান্তিনিকেতন, ৩য় খণ্ড ৭৫ পৃঃ) ব্রহ্মবিহার, পূর্ণতা, ভূমা (শান্তিনিকেতন, ৮ম খণ্ড), বিশ্ববোধ, (শান্তিনিকেতন, ১০ম খণ্ড) যাত্রীর উৎসব (শান্তিনিকেতন, ১৬শ খণ্ড)।

আমরা সংক্ষেপে দু চারিটি উক্তি তুলিয়া দিতেছি।

"আমাদের দেশে বহুর সঙ্গে ঐক্যযোগের নানা সুযোগ রচনা করতে না পারলে আমাদের মহত্ত্বের তপস্যা চলবে না।"[২]

১ ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা, পরিচয়, ৪১ পৃঃ।
২ দিন, শান্তিনিকেতন ৩য় খণ্ড, ৭ পৃঃ।

"এক এক জাতি নিজের ধর্মকে আয়রনচেষ্টে শিলমোহর দিয়ে রেখেচে। কিন্তু মানুষ মানুষের কাছে আজ যতই আসচে ততই সার্বভৌমিক ধর্মবোধের প্রয়োজন মানুষ বেশি করে অনুভব করচে।"[১]

"মানুষের ধর্মরাজ্যে যে তিনজন (বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ) সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিরোহন করেছেন এবং ধর্মকে দেশগত, জাতিগত, লোকাচারগত সঙ্কীর্ণ সীমা থেকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে সূর্যের আলোকের মত, মেঘের বারি বর্ষণের মত সর্বদেশ ও সর্বকালের মানবের জন্য বাধাহীন আকাশে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তাঁদের নাম করেছি। ধর্মের প্রকৃতি যে বিশ্বজনীন, তাকে যে কোনো বিশেষ দেশের প্রচলিত মূর্তি বা আচার বা শাস্ত্র কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না··· ।[২]

"ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে সে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা, আজ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ এবং ইংরাজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করচে···।"[৩]

"এইরূপে পৃথিবীতে যে চারি প্রধান ধর্মকে আশ্রয় করিয়া চার বৃহৎ সমাজ আছে—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান—তাহারা সকলেই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিয়াছে।··· ইহা নিশ্চয় জানা চাই, প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অঙ্গ।··· বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।"[৪]

"পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শ রূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তি-দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে।"[৫]

১ অগ্রসর হওয়ার আহ্বান, শান্তিনিকেতন, ১৭শ খণ্ড, ৩১ পৃঃ।
২ ভক্ত, শান্তিনিকেতন, ১০ম খণ্ড, ২০ পৃঃ।
৩ তপোবন, শান্তিনিকেতন, ৯ম খণ্ড, ৯১ পৃঃ।
৪ সমূহ, স্বদেশী সমাজ, ২২, ২৪, ২৬ পৃঃ।
৫ ভারতবর্ষের ইতিহাস, স্বদেশ, ৫৭ পৃঃ।

"ভারতবর্ষেও যে ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে এ ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য এ নয় যে, এদেশে হিন্দুই বড় হইবে বা আর কেহ বড় হইবে।[১] ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে ; ইহা অপেক্ষা কোন ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই। ···রামমোহন রায় মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন।··· আমরা সমস্ত পৃথিবীর, আমাদের জন্যই বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করিয়াছেন"।* এই স্থলে গীতাঞ্জলির সেই কবিতাটির কথাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, "হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগরে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

মাঘোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "আমি বল্‌চি আমাদের এই উৎসব মানবসমাজের উৎসব··· যিনি সত্যম্ তাঁর আলোকে এই উৎসবকে আজ প্রসারিত করে দেখব, আমাদের এই প্রাঙ্গণ আজ পৃথিবীর মহা প্রাঙ্গণ, এর ক্ষুদ্রতা নেই।"[২]

"আজ প্রকাণ্ড উৎসব,··· এই উৎসব কোনো বিশেষ স্থানের নয় কোনো বিশেষ জাতির নয়—এই উৎসব সমগ্র মানবজাতির জন্য জগৎজোড়া উৎসব।"[৩]

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বাণী

"আধুনিক পৃথিবীতে··· ধর্মের নূতন বোধ··· এমন একটি ধর্মকে চাহিতেছে যাহা কোনো একটি বিশেষ জাতির বিশেষ কালের বিশেষ ধর্ম নহে ; যাহাকে কতকগুলি বাহ্য পূজাপদ্ধতির দ্বারা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় নাই ; মানুষের চিত্ত যতদূরই প্রসারিত হউক যে ধর্ম কোনোদিনই তাহাকে বাধা দিবে না ; বরঞ্চ সকলদিকেই তাহাকে মহানের দিকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিবে।··· ব্রহ্ম যে সত্যস্বরূপ তাহা আমরা যেমন বিশ্বসত্যের মধ্যে জানি, তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ তাহা যেমন আত্মজ্ঞানের মধ্যে বুঝিতে পারি, তেমনি

১ পূর্ব ও পশ্চিম, সমাজ, ১১৭—১২১ পৃঃ।

* এই প্রবন্ধটি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পঠিত হয়।

২ ধর্মের নবযুগ, সঞ্চয়, ২৮, ৩৩ পৃঃ।

৩ ধর্ম-শিক্ষা, সঞ্চয়, ৬৮, ৭০ পৃঃ।

তিনি যে রসস্বরূপ তাহা কেবলমাত্র ভক্তের আনন্দের মধ্যেই দেখতে পাই। ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে সে দেখা আমরা দেখিয়াছি এবং সে দেখা আমাদিগকে দেখাইয়া চলিতে হইবে।"[১]

"বস্তুত ইহা (ব্রাহ্মধর্ম) মানব ইতিহাসের সামগ্রী। মানুষ আপনার গভীরতম অভাবমোচনের জন্য নিয়ত যে গূঢ় চেষ্টা করিতেছে ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টির মধ্যে আমরা তাহারই পরিচয় পাই।··· মানুষের সমস্ত বোধকেই অনন্তের বোধের মধ্যে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার প্রয়াসই ব্রাহ্মধর্মের সাধনারূপে প্রকাশ পাইয়াছে।··· ব্রাহ্মসমাজের আরম্ভে ও আজ পর্যন্ত এই সত্যকেই আমরা সকলের চেয়ে বড় করিয়া দেখিতেছি।··· কোনো বিশেষ শাস্ত্র, বিশেষ মন্দির, বিশেষ দর্শনতত্ত্ব বা পূজা পদ্ধতি যদি এই মুক্ত সত্যের স্থান নিজে অধিকার করিয়া লইতে চেষ্টা করে তাহা ব্রাহ্মধর্মের স্বভাব বিরুদ্ধ হইবে।"[২]

"ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। শুধু কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিব। "এ কথা সত্য নয় যে ব্রাহ্মসমাজ কেবলমাত্র আধুনিককালের হিন্দুসমাজকে সংস্কার করবার একটা চেষ্টা, অথবা ঈশ্বরোপাসকের মনে জ্ঞান ও ভক্তির একটা সমন্বয় সাধনের বর্তমান-কালীন প্রয়াস। ব্রাহ্মসমাজ চিরন্তন ভারতবর্ষের একটি আধুনিক আত্মবিকাশ। ···বর্তমান কালের সংঘর্ষে ভারতবর্ষ ব্রাহ্মসমাজে আপনার সত্যরূপ প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।··· ব্রহ্মকে বিশ্ব ইতিহাসে বিশ্বধর্মে বিশ্বকর্মে সর্বত্রই সত্য করে দেখবার সাধনা··· যে সাধনা সকলকে গ্রহণ করতে ও সকলকে মিলিয়ে তুলতে পারে, যার দ্বারা জীবন একটি সর্বগ্রাহী সমগ্রের মধ্যে সর্বতোভাবে সত্য হয়ে উঠ্‌তে পারে সেই ব্রহ্মসাধনার পরিপূর্ণ মূর্তিকে ভারতবর্ষ বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবে এই হচ্চে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস।"[৩]

রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করলে আর যাহাই হউক ব্রাহ্মসমাজের সার্বভৌমিকতা নষ্ট হইবার যে কোনো সম্ভাবনা নাই তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কেহ এরূপ আপত্তি করিলে বুঝা যায় যে আপত্তিকারী রবীন্দ্রনাথের লেখার সাহত আদৌ পরিচিত নহেন।

১ নবযুগের উৎসব, শান্তিনিকেতন, ৫ম খণ্ড, ১পৃঃ।

২ বর্তমান যুগ, শান্তিনিকেতন, ৯ম খণ্ড, ১১০ পৃঃ।

৩ শান্তিনিকেতন, ১৩শ খণ্ড, ১০১ পৃঃ।

শ্রদ্ধেয় আদিনাথবাবুর পত্র

২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখের "তত্ত্ব-কৌমুদী" আজ ১০ই মার্চ প্রকাশিত হইল। এই সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনারারি সভ্য নির্বাচনের বিরুদ্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছেন।

আগামী ১৯শে মার্চ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থগিত অধিবেশনে এ সম্বন্ধে বিচার হইবে, মাত্র ৯ দিন পূর্বে সমাজের মুখপত্রে সভার আলোচ্য বিষয়ে কোনো চিঠি প্রকাশিত হইলে অধিবেশনের পূর্বে তাহার উত্তর দেওয়া শক্ত; বিশেষতঃ তত্ত্ব-কৌমুদীর ন্যায় পাক্ষিক পত্রে। এরূপ অবস্থায় শুধু একতরফা আলোচনার সুযোগ দেওয়া সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক কি না তাহাও চিন্তার বিষয়। যাহা হউক সময় অল্প বলিয়া নিতান্ত সংক্ষেপে কয়েকটি কথার আলোচনা করিব।

১। রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত সম্বন্ধে "তত্ত্ববোধিনীতে" কি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা লইয়া আন্দাজে[১] আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। ধর্ম, সঞ্চয় ও শান্তিনিকেতন সপ্তদশ খণ্ডে রবীন্দ্রনাথ নিজের ধর্মমত পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছেন। সকলেই পড়িয়া দেখিতে পারেন। ইহা ব্যতীত Sadhana ও Personality নামক ইংরাজি পুস্তকেও ধর্ম সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ আছে। উপরে এ বিষয়ে যথেষ্ট বলা হইয়াছে ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতও উদ্ধৃত করা হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

২। Census গণনার জন্য রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদিগকে একেশ্বরবাদী হিন্দুরূপে পরিগণিত করিতে চাহিয়াছেন। পত্রলেখক বলিতেছেন—"এ কথাটি আমার শ্রুত কথা" (২৫৮ পৃঃ)। শোনা কথা লইয়া আলোচনা করিবার মত সময় নাই।

৪। শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক লিখিয়াছেন "আমাদের মধ্যে অনেকে যে বিবাহের সময় রেজিষ্টারি করিতে অনিচ্ছুক হইতেছেন, তাহাও সম্ভবতঃ স্যর রবীন্দ্রনাথের মতের প্রভাবে।" (২৫৮ পৃঃ) প্রথমেই বলা আবশ্যক যে বর্তমান কালে "রেজিষ্টারি করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছেন" এরূপ কোনও ব্রাহ্মের কথা আমরা জানি না। তাহার পর পত্রলেখক মহাশয় নিজেই বলিতেছেন "সম্ভবতঃ"

১ পত্রলেখক বলিতেছেন (২৫৮ পৃঃ) "প্রবন্ধ একটি কি বেশি মনে নাই"। পত্রখানি লিখিবার সময়ে কি একটিও প্রবন্ধ সম্মুখে ছিল?

রবীন্দ্রনাথের মতের প্রভাবে! এমন কি "শোনা কথাও" নয়—ইহারও আলোচনা অনাবশ্যক।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন ও ব্রাহ্ম বিবাহে রেজিষ্টারি করা সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজে যে বহুদিন হইতে মতভেদ আছে শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয়ের কি সে কথা জানা নাই? রবীন্দ্রনাথের মতের প্রভাবেই ৩ আইন সম্বন্ধে আপত্তি উঠিয়াছে, একথা সত্য নহে। দুয়েকটি কথা স্মরণ করাইয়া দিব।

স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভায় প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছেন যে ধর্মবিবাহে রেজিষ্টারি অনাবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৮ বৎসর মাত্র।

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এ বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। "ধার্মিক ব্যক্তিরা এই বিবাহপদ্ধতির কি প্রকারে অনুমোদন করেন তাহা বুঝিতে পারি না।" (আত্মচরিত, ১৯১ পৃঃ)। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ১১ বৎসর।

৩০।৩৫ বৎসর পূর্বেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত কোনো কোনো ব্যক্তি রেজিষ্টারি না করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহাও কি রবীন্দ্রনাথের মতের প্রভাবে?*

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে একাধিকবার ৩ আইন সংশোধন করিবার জন্য গবর্নমেণ্টের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। "আমি হিন্দু নই" ইত্যাদিরূপ স্বীকারোক্তি উঠাইয়া দিবার জন্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু যখন চেষ্টা করিতেছিলেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তখন তাঁহার সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। বস্তুতঃ ৩ আইনের সহিত ধর্মমতের কোনো সম্পর্ক নাই।

এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের সার্বভৌমিকতার কথা তুলিয়াছেন। আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করিলে, আর যাহাই হউক, ব্রাহ্মসমাজের সার্বভৌমিকতা বা বিশ্বজনীনতা নষ্ট হইবে না। বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

* ৩ আইন সম্বন্ধে আলোচনা করা এস্থলে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে, তথাপি একটি কথা বলা যাইতে পারে, ৩ আইন অনুসারে রেজিষ্টারি হয় নাই এরূপ বিবাহমাত্রেই দুর্নীতির পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রাচীন হিন্দু সমাজের কথা ছাড়িয়া দিলেও সংস্কারক আদি ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজে রেজিষ্টারি না করিয়া বিবাহ হয়।

রবীন্দ্রনাথ ও ধর্মপ্রচার

শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ "কয়েক বৎসর পূর্বে একটি বক্তৃতায় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার চেষ্টার বিশেষ ভাবে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।" (২৫৯ পৃঃ)

প্রবন্ধটি "ধর্মপ্রচার" নামে আজ ১০।১২ বৎসর হইল মুদ্রিত হইয়াছে, সকলেই পড়িয়া দেখিতে পারেন। শোনা কথা লইয়া আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। রবীন্দ্রনাথ প্রচার চেষ্টার নিন্দা করেন নাই বিশেষ বিশেষ প্রণালীর সমালোচনা করিয়াছেন। শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়—প্রচার পদ্ধতি সম্বন্ধে বার্ষিক আলোচনা প্রসঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক প্রবীণ নেতা (এবং প্রচারক মহাশয়েরাও) অনেকবার প্রচারপ্রণালীর সমালোচনা করিয়াছেন। প্রণালীর সমালোচনা করিলেই প্রচার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয় না। আরও দ্রষ্টব্য এই যে রবীন্দ্রনাথের এই ধর্মপ্রচার নামক প্রবন্ধটি Theistic Conference উপলক্ষে বিশেষ ভাবে প্রচার সম্বন্ধীয় আলোচনা সভায় পঠিত হইয়াছিল—ইহা সাধারণ একটি বক্তৃতা মাত্র নহে, ইহার উদ্দেশ্যই ছিল প্রচার সম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগের সহিত আলোচনা করা।

তত্ত্বকৌমুদী (২৯শে এপ্রিল, ১৯১২) সম্পাদকীয় মন্তব্যে আছে, "কোন প্রবীণ ব্রাহ্মবন্ধু ব্রাহ্মধর্ম প্রচার সম্বন্ধে আলোচনাতে বলিয়াছিলেন এখনত আর প্রচার হইতেছে না, পৌরহিত্য হইতেছে। ভাবিয়া দেখিলে কথাটা ঠিক বলিয়াই মনে হয়।" রবীন্দ্রনাথ এরূপ শক্ত কথা ব্যবহার করেন নাই, অথচ তাঁহার সমালোচনাকে "নিন্দা" বলা হইল।

ধর্মপ্রচার করিতে গিয়া বিরোধ বা দলাদলির সৃষ্টি না হয়, রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বারংবার বলিয়াছেন।

এই "ধর্ম প্রচার" প্রবন্ধে আছে "অথচ সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়···ব্রহ্ম ধন্য—তিনি সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্বজীবে ধন্য—তিনি কোনো দলের নহেন, কোনো সমাজের নহেন, কোনো বিশেষ ধর্মপ্রণালীর নহেন।" ইহাকে প্রচার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বলা যায় না।

"ধর্ম-প্রচারকার্যে ধর্মটা আগে, প্রচারটা তাহার পরে। প্রচার করিলেই

তবে ধর্ম রক্ষা হইবে, তাহা নহে, ধর্মকে রক্ষা করিলেই প্রচার আপনি হইবে।" ইহাকে কি নিন্দা বলে?

এস্থলে আরও দুয়েকটি কথা স্মরণ করা আবশ্যক। এই ধর্মপ্রচার প্রবন্ধটি পড়িবার ৬ বৎসর পরে কার্যনির্বাহক সভা ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের, ২০শে নভেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত resolutionটি গ্রহণ করেন।

"Resolved that the Executive Committee of the S. B. Samaj offer their hearty congratulations to Babu Rabindranath Tagore on the unique distinction he has won by obtaining the Nobel Prize for his Gitanjali and other works which are a noble expression of some of the most impressive aspects of the spiritual and ethical teachings of the Brahmo Samaj."

ধর্মপ্রচার প্রবন্ধটি অন্যূন ১২।১৩ বৎসর পূর্বের লেখা। চার বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কি বলা হইয়াছে দেখা যাউক।

Indian Messenger, July 22, 1917, p. 338 :—

"The Members of the Sadharan Brahmo Samaj assembled at rhe Rammohun Library on Tuesday last to accord a warm reception to Sir Rabindranath Tagore.

"After the opening song Pandit Navadwip Chandra Das offered a prayer. Then Babu Krishna Kumar Mitra, as President of the Sadharan Brahmo Samaj, welcomed Sir Rabindranath and paid a glowing tribute to the poet for delivering to the world through his speeches, writings, poems and songs the message of the Brahmo Samaj."

তৎপরের সংখ্যায় (July 29, 1917, p. 350) সম্পাদক লিখিয়াছেন :—

"The message of Sir Rabindranath is the message of the Brahmo Samaj. In the tribute that Babu Krishna Kumar paid on behalf of the members of the Sadharan Brahmo Samaj, nothing was so clear and unmistakable as this."

আমরা এই রবীন্দ্রনাথকেই সম্মানিত সভ্য নির্বাচন করিতে চাহিয়াছি।

জাতিভেদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত

জাতিভেদ সম্বন্ধে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"মানুষ যেখানে স্বভাবত স্বাধীন, ধর্মত স্বাধীন, আমাদের সমাজ সেখানে তার খাওয়া শোওয়া বসাকেও নিতান্ত অর্থহীন বন্ধনে বেঁধেছে।"

"পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিষ করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষে আমরা একি ভয়ঙ্কর অধর্ম করিতেছি! উৎপাত ডাকিয়া আনিয়া মুসলমানকে যে লোক পীড়ন করিতেছে তাহারই ঘরে আমার জাত থাকিবে আর উৎপাত স্বীকার করিয়াও মুসলমানের ছেলেকে যে রক্ষা করিতেছে এবং সমাজের নিন্দাও বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহারই ঘরে আমার জাত নষ্ট হইবে!"[১]

"একটা বিড়াল পাতের কাছে বসে ভাত খেলে কোনো দোষ হয় না, অথচ একজন মানুষ সে ঘরে প্রবেশ করলে ভাত ফেলে দিতে হয়—মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপমান এবং ঘৃণা যে জাতিভেদে জন্মায় সেটাকে অধর্ম না বলে কি বলব? মানুষকে যারা এমন ভয়ানক অবজ্ঞা করতে পারে, তারা কখনই পৃথিবীতে বড় হতে পারে না—অন্যের অবজ্ঞা তাদের সহিতেই হবে।"[২]

"এদেশে লাঞ্ছিত অত্যাচার প্রাপ্ত সাধারণ লোকের" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি বলিয়াছেন তাহা গীতাঞ্জলির মধ্যে, "হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান" এই কবিতাটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

খুব আধুনিক ইংরাজি লেখা হইতে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Nationalists say, for example, look at Switzerland, where inspite of race differences, the peoples have solidified into a nation. Yet remember that in Switzerland the races can mingle, they can intermarry. In India there is no common birthright. And when we talk of Western Nationalism we forget that the nations there do not have physical repulsion, one for the other that we have between different castes. Have we an instance in the whole world where a people who are not allowed

১ গোরা, ১৮১ পৃঃ।

২ গোরা, ১৬৮-৬৯ পৃঃ। [আষাঢ় ১৩৮৯]

to mingle their blood shed their blood for another except by coercion or for mercenary purposes? And can we ever hope that these moral barriers against our race amalgamation will not stand in the way of our political unity?"[১]

Nationalism in India (p. 135) "The thing we, in India, have to think of is this—to remove those social customs and ideals which have generated a want of self-respect and a complete dependence on those above us—a state of affairs which has been brought about entirely by the domination in India of the caste system and the blind and lazy habit of relying upon the authority of traditions that are incongruous anachronisms in the present age."

(P. 138) "Therefore in her caste regulations India recognised differences, but not the mutability which is the law of life. In trying to avoid collisions she set up boundaries of immovable walls, thus giving to her numerous races the negative benefit of peace and order but not the positive opportunity of expansion and movement. She accepted nature where it produces diversity but ignored it where it uses that deversity for its world game of infinite permutations and combinations. She treated life in all truth where it is manifold, but insulted where it is ever moving. Therefore life departed from her social system."

জাতিভেদ সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক।

জাতিভেদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বর্তমানকালে কিরূপ তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহাও সকলে জানেন। যে আদি সমাজের বেদীতে একমাত্র ব্রাহ্মণের অধিকার লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রথম বিচ্ছেদ ঘটে, সেই আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে রবীন্দ্রনাথই প্রথম অব্রাহ্মণ আচার্য দ্বারা উপাসনা কার্য সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করেন। শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় এই আচার্যগণের মধ্যে একজন।

১ *Nationalism in India*, p. 146.

এই জাতিভেদ লইয়া আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত রবীন্দ্রনাথের যে বিরোধ উপস্থিত হয় এবং যাহার ফলে আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে হয়—তাহাও সকলেরই জানা আছে।

"অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে পত্র" (প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২৬, ২২০ পৃঃ)

শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিতেছেন :—"আপনার জিজ্ঞাসিত বিষয়টির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভায়াদিগের মতের সঙ্গে আমার মতের একটুও অমিল নাই। অসবর্ণ বিবাহও তো বিবাহ, তাহা তো আর অবিবাহ নহে।"

অসবর্ণ-বিবাহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎভাবে অনেকবার কথা বলিয়াছি। তিনি যে শুধু ইহার সমর্থন করিয়াছেন তাহা নহে, বরাবর এই সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি একথাও স্পষ্ট বলিয়াছেন যে "আমার যদি অবিবাহিত কন্যা থাকিত তবে আমি নিশ্চয়ই অব্রাহ্মণের সহিত তাহার বিবাহ দিতাম।" শুধু অসবর্ণ বিবাহ নয়, হিন্দু মুসলমানের বিবাহ যদি ব্রাহ্মমতে সম্পন্ন হয় তবে নিজে উপযাচক হইয়া বিবাহে আচার্যের কার্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছুক আছেন, এরূপ কথা আমি তাঁহার নিজের মুখে স্বকর্ণে শুনিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের নিজের চাকর অতি "নীচ" জাতীয়, তাহার হস্তেই তিনি সর্বদা আহার করিয়া থাকেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমে কোনো একটি মুসলমান ছাত্রের বাসনমাজা লইয়া যখন কিছু গোলমাল হয় তখন রবীন্দ্রনাথ বিশেষ দৃঢ়তার সহিত জাতিবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এ সমস্ত আমাদের জানা কথা।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি। শুনিলাম এখনও ব্রাহ্মসমাজের অনেক শ্রদ্ধের ব্যক্তির মনে এরূপ ধারণা আছে যে রবীন্দ্রনাথের পৈতা আছে; এই কথাটি চতুর্দিকে প্রচারিতও হইতেছে। স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক যে আমরা সাক্ষাৎভাবে জানি যে রবীন্দ্রনাথের পৈতা নাই। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষেও তিনি কখনো পৈতা ব্যবহার করেন না। পৈতা সম্বন্ধে কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা; আশা করি এরূপ মিথ্যা কথা ভবিষ্যতে আর প্রচারিত হইবে না।*

* জাতিভেদ সম্বন্ধে যথেষ্ট উদ্ধৃত করিয়াছি। ছোট ও বড় (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৪) বাতায়নিকের পত্র (প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২৬) মিলনের সৃষ্টি (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৬) বিলাত-যাত্রীর পত্র (শান্তিনিকেতন পত্রিকা, আষাঢ়, ১৩২৭) প্রভৃতি আরও অনেক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা আছে। ইংরাজি আরও অনেক বক্তৃতায় জাতিভেদের প্রতিবাদ আছে, বাহুল্য বোধে আর উদ্ধৃত করিলাম না।

নারীর অধিকার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত

পত্রলেখক মহাশয় লিখিয়াছেন (২৫৯ পৃঃ) যে ব্রাহ্মসমাজ "নারীগণের দুর্গতি দূর করিবার জন্য বিশেষ ইচ্ছুক, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের এই প্রচেষ্টার প্রতিকূলে মত জ্ঞাপন করিয়াছেন, বক্তৃতা করিয়াছেন।" এরূপ অভিযোগ শুনিলে বুঝা যায় যে পত্রলেখক মহাশয় রবীন্দ্রনাথের লেখার সহিত পরিচিত নহেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

"স্ত্রীজাতির স্নেহ-দয়া-সৌজন্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, আমাদের মধ্যে এমন হতভাগ্য কয়জন আছে? কিন্তু ক্ষুদ্র হৃদয়ের স্বভাব এই যে, সে যে পরিমাণে অযাচিত উপকার প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে অকৃতজ্ঞ হইয়া উঠে।··· সাধারণত আমরা স্ত্রীজাতির প্রতি ঈর্ষাবিশিষ্ট; অবলা স্ত্রীলোকের সুখ-স্বাস্থ্য-স্বচ্ছন্দতা আমাদের নিকট পরম পরিহাসের বিষয়, প্রহসনের উপকরণ। আমাদের ক্ষুদ্রতা ও কাপুরুষতার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ইহাও একটি।"[১]

"দেখি একটি সাহেবী কাপড় পরা বাঙালী নিজে মাথায় দিব্যি ছাতা দিয়ে তার স্ত্রীকে গাড়ী থেকে নাবালে।··· সে বেচারি শীতে ও লজ্জায় জড়সড় হয়ে ভিজতে লাগল। আমার এক মুহূর্তে মনে পড়ে গেল সমস্ত বাংলা দেশে কি রৌদ্রে কি বৃষ্টিতে কি ভদ্র কি অভদ্র কোনো স্ত্রীলোকের মাথায় ছাতা নেই। যখন দেখলুম স্বামীটা নির্লজ্জ ভাবে মাথায় ছাতা দিয়েছে, আর তার স্ত্রী গায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে নীরবে ভিজচে, এই ব্যবহারটাকে মনে মনেও নিন্দা করচে না—এবং ষ্টেশনশুদ্ধ কোনো লোকের মনে এটা কিছুমাত্র অন্যায় বলে বোধ হচ্ছে না তখন থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আমরা স্ত্রীলোকদের অত্যন্ত সমাদর করি, তাদের লক্ষ্মী বলে দেবী বলে জানি এসমস্ত অলীক কাব্যকথা আর কোনো দিন মুখেও উচ্চারণ করব না।"[২]

স্ত্রীর পত্র, হৈমন্তী, অপরিচিতা, পাত্র ও পাত্রী প্রভৃতি গল্প, মুক্তি, নিষ্কৃতি প্রভৃতি কবিতা ও জাপানযাত্রীর পত্রে, মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক উচ্চ আদর্শ পাওয়া যায় কিন্তু উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই।

কন্যাদায় ও বরপণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"এমন লজ্জাকর ও অপমানকর প্রথা আর নাই। জীবনের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দোকানদারী দিয়া আরম্ভ করা,

১ বিদ্যাসাগর চরিত, ২৩ পৃঃ।

২ গোরা, ১৯৭ পৃঃ।

যাহারা আজ বাদ কাল আমার আত্মীয় শ্রেণীতে গণ্য হইবে আত্মীয়তার অধিকার স্থাপন লইয়া তাহাদের সঙ্গে নির্লজ্জভাবে নির্মমভাবে দর দাম করিতে থাকা—এমন দুঃসহ নীচতা যে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, সে সমাজের কল্যাণ নাই, সে সমাজ নিশ্চয়ই নষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে।"[১]

"কেবল মাত্র গৃহলুণ্ঠিত কোমল হৃদয়রাশি হয়ে থাকলে চল্‌বে না, মেরুদণ্ডের উপর ভর করে উন্নত উৎসাহী ভাবে স্বামীর পার্শ্বচারিণী হতে হবে। অতএব স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত না হলে বর্তমান শিক্ষিত সমাজে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়···।"[২]

"It is not that every woman should be made to learn the culinary art or that should have no higher ambition than to be a cook or a house-manager. Woman has a right to learn the Science and Arts that man learns and to enter, as far as practicable, the walks of life that man usually seeks."*

বহুদিন পূর্বে শান্তিনিকেতনে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন; এখনও সেখানে সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েরা ছেলেদের সহিত একসঙ্গে পড়াশুনা করিয়া থাকে। নূতন প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতেও মেয়েদের জন্য শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেখানে অবাধে পুরুষের সহিত সমানভাবে মেয়েরা শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদান করিতেছেন।

"স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ।"[৩]

"সিদ্ধার্থের তপস্যায় স্ত্রী ছিলেন না, আমার তপস্যায় স্ত্রীকে চাই।"[৪]

"This world is suffering because of unbalanced equilibrium, and that woman's part in righting the wrong will be creation of a new civilisation... They will manage to establish harmony

১ বিলাসের ফাঁস, সমাজ, ২৭ পৃঃ।
২ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, সমাজ, ৬৩ পৃঃ।
* *Modern Review*, April, 1919.
৩ ঘরে বাইরে, ২ পৃঃ।
৪ ঐ, ১০২ পৃঃ।

between the general good of the public and happiness of individuals... With conditions as they are, woman must take a larger share in the world's work than she has ever done before... And so it is Woman—despired of the East, misunderstood of the West—who carries a torch to light the feet of the race in its long, long progress to destiny."*

সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে অন্যান্য কথা

বাল্যবিবাহ লইয়া একটি আলোচনার অবতারণা করা হইয়াছে। বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধটি পড়িয়াছিলেন তাহা ৩৫ বৎসর পূর্বে। বর্তমান রবীন্দ্রনাথকেই অনারারি সভ্য নির্বাচন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ৩৫ বৎসর পূর্বের কথা আলোচনা করিবার কি প্রয়োজন আছে বুঝি না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কোনো কন্যার বিবাহ বাল্যাবস্থায় দিয়াছিলেন—সেও আজ ২২ বৎসরের কথা। তখন মহর্ষি জীবিত ছিলেন, বিবাহ প্রভৃতি পারিবারিক ঘটনায় তাঁহার কতখানি হাত ছিল তাহা সকলেই জানেন, সে সময়কার পারিবারিক কথা লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না।

কিন্তু স্মরণ রাখা আবশ্যক যে রবীন্দ্রনাথ পরে তাঁহার যে কন্যার বিবাহ দিয়া-ছিলেন তাহা বাল্য-বিবাহ নহে; এবং পুত্রের বিবাহের সময়ে তাঁহার পুত্রবধূর বয়স ১৭ বৎসর হইয়াছিল।†

শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় বলিতেছেন "তখন তাঁহাকে এরূপ আচরণের হেতু জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে আবশ্যক হইলে আমি বাল্যবিবাহের স্বপক্ষেই আবার ঐরূপ বক্তৃতা করিতে পারি।" (২৫৯ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথ যে ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন তাহার কি কোনো প্রমাণ আছে?

* Interview in America, 1921.

† মহর্ষিদেব যে তাঁহার কন্যাদের বাল্য-বিবাহ দিয়াছেন তাহা জানা কথা। ভাণ্ডারকর মহাশয় মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্বে সম্মানিত সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন। সার ভাণ্ডারকর মহাশয় তাঁহার পুত্র, কন্যা, পৌত্র ও পৌত্রীর কবে কাহাকে কত বৎসর বয়সে বিবাহ দিয়াছেন, শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় সে সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করিয়াছেন কি?

না, এটিও "শোনা কথা"? বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে "শোনা কথা" আমাদেরও জানা আছে—পার্থক্য এই যে আমরা তাহা রবীন্দ্রনাথের নিজমুখ হইতে স্বকর্ণে শুনিয়াছি এবং এই কথা শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় যেরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তথাপি শোনা কথা লইয়া আলোচনা করিব না।

বর্তমান কালে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য আছেন এরূপ অনেক ব্যক্তি ৩৫ বৎসর পূর্বে নিজেরাই বাল্যবিবাহ করিয়াছিলেন—বর্তমান কালে তাঁহাদের সভ্য থাকায় সেজন্য কোনো বাধা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই।

কয়েক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ নিজের একমাত্র পুত্রের বিধবা বিবাহ দিয়াছেন তাহাও সকলেই জানেন। অতএব সমাজসংস্কার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই।

সাহিত্য বিচার

শ্রদ্ধেয় পত্রপ্রেরক মহাশয় লিখিয়াছেন "রবীন্দ্রনাথের কৃত কোন কোন উপন্যাসে সমাজ স্থিতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় যে সকল স্থরীতি-নীতি সমাজ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার বিরুদ্ধেও অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে (২৫৯ পৃঃ)।"[১]

এসকল মতামত উপন্যাসের বিশেষ কোনো পাত্রের মতামত বলিয়াই ব্যক্ত করা হইয়াছে; তাহা যে রবীন্দ্রনাথের নিজের মতামত নহে একথা কি শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় জানেন না?[২]

উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদিগের মধ্যে নানা বিভিন্ন চরিত্রের লোক আছে, তাহাদের মতামতও নানা বিভিন্ন প্রকারের। আপত্তিযোগ্য যে কোনো মতামতই লেখকের মতামত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা কিংবা সেরূপ ইঙ্গিত করা যে নিতান্ত অন্যায় তাহা বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক নাই।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, গল্প, নাটক প্রভৃতি রচনায় নিশ্চয়ই এমন অনেক চরিত্র আছে যাহা সাধু-চরিত্র নহে। কিন্তু সংসারে ভালোমন্দর দ্বন্দ্ব লইয়াই

১ পত্রলেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সমালোচনা "এদেশের সংবাদ পত্রাদিতেও ব্যক্ত হইয়াছে।" রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে হইলেই কি "নায়ক" প্রভৃতি সংবাদপত্রের মতামতও প্রামাণ্য হইয়া উঠে?

২ উপন্যাসখানি কি তিনি নিজে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন, না এক্ষেত্রেও শোনা কথার উপরেই সমালোচনা চলিতেছে?

চিরদিন সাহিত্য রচনা হইয়াছে। "তাই রামায়ণে দেখিয়াছি, রাম-রাবণের যুদ্ধ; মহাভারতে দেখিয়াছি কুরুপাণ্ডবের বিরোধ। কেবলি একটানা ভালো, কোথাও মন্দের কোনো আভাসমাত্র নেই, এমনতর নিছক চিনির সরবত দিয়াই সাহিত্যের ভোজ সম্পন্ন করা অন্তত কোনো বড় যজ্ঞে দেখি নাই।··· শিশুরা যে রূপকথা শোনে, সেই রূপকথাতেও রাক্ষস আছে; সেই রাক্ষস শুদ্ধ সংযত হইয়া কেবলি মনুসংহিতা আওড়ায় না; সে বলে হাঁউ মাঁউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ। ধর্মনীতির দিক হইতে দেখিলে তাহার পক্ষে এমন কথা বলা নিঃসন্দেহ গুরুতর অপরাধ।··· কিন্তু মানুষের গন্ধে রাক্ষসের ভ্রাতৃ-প্রেম যদি জাগিয়া উঠিত এবং সে যদি সুমধুর স্বরে বলিয়া উঠিত অহিংসাপরমোধর্ম, তবে সাহিত্যর সুনীতি অনুসারে রাক্ষসের সে অপরাধ কিছুতে ক্ষমা করা চলিত না।··· আমি কৈফিয়ৎ স্বরূপ বাল্মীকির দোহাই মানিব, তিনি কেন, রাবণকে দিয়া সীতার অপমান ঘটাইলেন? তিনি ত অনায়াসেই রাবণকে দিয়া বলাইতে পারিতেন যে, মা লক্ষ্মী, আমি বিশহাতে তোমার পায়ের ধুলা লইয়া দশ ললাটে তিলক কাটিতে আসিয়াছি।—বেদব্যাস কেন দুঃশাসনকে দিয়া জয়দ্রথকে দিয়া দ্রৌপদীকে অপমান করাইয়াছেন?"*

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার নয়নতারা নামক উপন্যাসে ডাক্তার ন্যাণ্ড, বা অসচ্চরিত্র মাতাল গোষ্ঠবিহারীর যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা কি তিনি আদর্শ চরিত্র বলিয়া মনে করিতেন? ঐ পুস্তকেই দেখিতে পাই যে যোগেশ অতিরিক্ত মদ খাইয়া অসভ্যতা করিতেছে, মেয়েদের অপমান করিতেছে (২৯৮ পৃঃ), দুশ্চরিত্র গিরিধারী নয়নতারার নিকট অসদভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে (৩৩০ পৃঃ)। শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয়ের অবলম্বিত সমালোচনা রীতি অনুসারে বলিতে হয় যে মদখাওয়া অথবা মেয়েদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সম্বন্ধে যোগেশ অথবা গিরিধারীর মতামতই শাস্ত্রীমহাশয়ের মতামত! এইরূপ সমালোচনা প্রণালী যে নিতান্ত অন্যায়, তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? তবে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এরূপ প্রণালী অবলম্বিত হইল কেন?

স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ যে কত উচ্চ তাহা তাঁহার নানা রচনার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। কালিদাসের কাব্য সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।† শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় সে সকল

* সাহিত্যবিচার, প্রবাসী, ১৩২৬, ৫২৫ পৃঃ।

† প্রাচীন সাহিত্য।

আলোচনা উপেক্ষা করিয়া উপন্যাসের কোনো এক বিশেষ নায়কের মতামতকে রবীন্দ্রনাথের মত বলিয়া প্রচার করিতে অথবা সেরূপ ইঙ্গিত করিতে চেষ্টা করিলেন কেন ?

শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো উপন্যাস ও রচনাকে রুচিতে হীন ও অশ্লীল বলিয়াছেন। "পছন্দ লইয়া মানুষের সঙ্গে তর্ক চলে না"; অতএব রুচি সম্বন্ধে আলোচনা করিব না। তবে একথা বলা কর্তব্য যে রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখাকে কুরুচিপূর্ণ বা অশ্লীল মনে করি না, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ বাক্য প্রয়োগ নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায় বিবেচনা করি।

সাহিত্যরচনায় ভাষা কোন ক্ষেত্রে বাস্তবকে কতখানি পর্যন্ত প্রকাশ করিবে তাহার কোনো ধরাবাঁধা আইন নাই। যেমন শারীরিক পরিচ্ছদে এক দেশে পা দুখানি খোলা রাখিলে দোষ হয় না, আবার অন্য দেশে খোলা রাখিলে নিতান্ত অসভ্যতা হয়, সেইরূপ সাহিত্যের আবরণেও সর্বত্র সমান মাপকাঠি চলে না। রামায়ণ মহাভারতেও অনেকের মতে অশ্লীল অনেক অংশ আছে, কিন্তু তাই বলিয়া কি ঐগ্রন্থ কেহ বাড়িতে স্থান দেন না, না ব্যাস বাল্মীকিকে অশ্লীল কবিতা রচনাকারী বলিয়া নিন্দা করেন ?

কোনো রচনাকে অশ্লীল বলিবার পূর্বে দেখিতে হইবে বাস্তবিক তাহা কোনো দুর্নীতিকে পরিপোষণ করিতেছে, না কেবলমাত্র ব্যক্তিগত পছন্দের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কোনো বয়সের কোনো রচনায় পরিণামে সুনীতির অপমান হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।*

শ্রদ্ধেয় পত্রপ্রেরক মহাশয় লিখিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের "কৃত একখানি উপন্যাসে ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগের প্রতিও বিশেষ কটাক্ষ করা হইয়াছে"। (২৬০ পৃঃ) পত্রলেখক মহাশয় সম্ভবতঃ গোরা উপন্যাসখানির কথা বলিতেছেন। এই উপন্যাসে পরেশবাবুর ন্যায় উন্নত ব্রাহ্ম চরিত্র এবং সুচরিতা ও ললিতার ন্যায় মহিমান্বিত নারীচরিত্র উপেক্ষা করিয়া শুধু সঙ্কীর্ণমনা ব্রাহ্মচরিত্রের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িল কেন জানি না। সঙ্কীর্ণমনা ব্রাহ্মচরিত্র আঁকিয়াছেন বলিয়াই

* শ্লীলতার আদর্শ বিশেষভাবে ব্যক্তিগত পছন্দের উপর নির্ভর করে। শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় কি জানেন না যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে প্রদত্ত ধর্মোপদেশে অশ্লীল কথা ব্যবহার করা হইয়াছে, এরূপ অভিযোগ একাধিক আচার্য সম্বন্ধে অনেকবার উঠিয়াছে ?

কি প্রমাণ হয় যে ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে কিছু বলাই রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ছিল ? দুর্যোধন, দুঃশাসন, জয়দ্রথ হিন্দু ছিলেন, তাহাতে কি প্রমাণ হয় যে হিন্দুদিগের প্রতি কটাক্ষ করাই মহাভারতকারের উদ্দেশ্য ছিল ? শাস্ত্রী মহাশয়ের নয়নতারা উপন্যাসে দেখিতে পাই, সুরেশচন্দ্র বারবার "বেম্মা, বেম্মা" করিতেছে (৮৬ পৃ.), বলিতেছে "আমি ঈশ্বর টীশ্বর কিছু বুঝ্‌তে পারি না" (৮৮ পৃঃ), নয়নতারা নিজে হরেন্দ্রের গোঁড়ামিতে বিরক্ত হইয়া বলিতেছে "এই জন্যই লোকে ব্রাহ্মদের দেখতে পারে না"। (২২৩ পৃঃ) ইহাতে কি প্রমাণ হয় যে ব্রাহ্মসমাজকে ঠাট্টা করাই শাস্ত্রী মহাশয়ের যথার্থ অভিপ্রায় ছিল ?

আসল কথা এই যে অন্যান্য সমাজেও যেমন ব্রাহ্মসমাজেও ঠিক তেমনি ভালো-মন্দ দুই প্রকারের লোকই আছে; এবং অধিকাংশ লোকই ভালো ও মন্দ দুই মিশাইয়া। উদারচেতা ও উন্নতমনা ব্রাহ্মের সঙ্গে সঙ্গে দুজন সঙ্কীর্ণমনা ব্রাহ্মের চিত্র অঙ্কন করা কিছুই অস্বাভাবিক হয় নাই, বরং ন্যায় বিচারই করা হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় পত্রলেখকমহাশয়ের কি বিশ্বাস যে ব্রাহ্মসমাজে সঙ্কীর্ণমনা লোক আদৌ নাই ?

গোরা উপন্যাসখানিরই শেষ পৃষ্ঠায় আছে :—

"গোরা পরেশকে কহিল, আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দুমুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"

সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে আরেকটি কথা বলিয়া শেষ করিব। মানব জীবনের ন্যায়, সাহিত্যের বিচারও সমগ্রকে লইয়া। সেক্সপিয়ার বা কালিদাসের কাব্য সমালোচনা কেহ তাঁহাদের অল্প বয়সের বা বিশেষ কোনো সময়ের রচনা লইয়া করে না। রবীন্দ্রনাথের রচনা বিচার করিতে হইলে তাঁহার সমস্ত রচনাকে লইয়াই করা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনার সহিত মিলাইয়া না দেখিলে কোনো আংশিক বিচার দ্বারা তাঁর প্রতি গভীর অবিচার করা হইবে বলিয়াই আমাদিগের বিশ্বাস।

আদিনাথবাবুর অন্যান্য কথা

মেট্রপলিটান কলেজ হলে কয়েক বৎসর পূর্বে প্রদত্ত বক্তৃতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে (২৫৯ পৃঃ)। গত ২০ বৎসরের মধ্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কোনো

লেখার মধ্যে এই বক্তৃতা খুঁজিয়া পাইলাম না। এক্ষেত্রেও কি শুধু শোনা কথার উপরেই আলোচনা চলিতেছে? পত্রপ্রেরক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া reference দিলে সুবিধা হইত। মূল বক্তৃতাটি না পড়িয়া মতামত প্রকাশ করিতে পারিব না।

শ্রদ্ধেয় পত্রলেখকমহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "তিনি (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ) কেন আপনাকে কোনো সমাজেরই (অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের কোনো শাখার) প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিতেছেন না?" (২৭০ পৃঃ)

আর কোনো কারণ না থাকিলেও স্বাভাবিক বিনয়ই যে ইহার যথেষ্ট কারণ হইতে পারে, তাহা কল্পনা করা কি নিতান্ত কষ্টকর?

শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় লিখিয়াছেন:—"আমি উপরে যাহা ঠাকুর মহাশয়ের প্রচারিত ও সমর্থিত মত তাহারই সম্বন্ধে অলোচনা করিলাম। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে এস্থলে কোনো কথারই উল্লেখ করি নাই; সেরূপ কিছু করাকে সুরুচিসঙ্গত বলিয়া মনে করি না"। (২৬০ পৃঃ)

আমরা দেখাইয়াছি যে মতামত সম্বন্ধেও অধিকাংশই "শোনা কথা"। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন লইয়া আলোচনাও যদি "শোনা কথার" উপর নির্ভর করিয়া করা হয় তবে তাহা সুরুচিসঙ্গত এবং ন্যায়সঙ্গত না হইতে পারে বটে। খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য, কবীর হইতে আরম্ভ করিয়া, রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত কেহই কুৎসার হাত এড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে নানা প্রকার কুৎসা এক শ্রেণীর লোক চিরকালই প্রচার করিয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও এরূপ ধরনের কুৎসা প্রচারিত হওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু শোনা যায় বলিয়াই কি এসকল কথা বিশ্বাস করিতে হইবে?

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন আমাদের নিকট "শোনা কথা" নয় তাহা আমাদের স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ "দেখা কথা", এবং সেইজন্যই তাঁহাকে সম্মানিত সভ্য করিবার জন্য আমাদের এরূপ আগ্রহ।* যাহা হউক শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয়

* আরেকজনের দেখা কথা উদ্ধৃত করিতেছি; শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু লিখিয়াছেন (প্রবাসী, মাঘ ১৩২৭):—"আমি দীর্ঘকাল তাঁহার প্রতিবেশীরূপে তাঁহার দৈনন্দিন জীবন দেখিয়াছি, তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়াছি, বুধবারে ছাত্র অধ্যাপক ও সমাগত অন্য বহু ব্যক্তির সহিত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার উপাসনা ও উপদেশ শুনিয়াছি, তাঁহার বহিও পড়িয়াছি, স্বদেশে বিদেশে

ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যেরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন আমাদের মতে তাহা নিতান্ত সুরুচিবিগর্হিত ও অন্যায় হইয়াছে। এই প্রকার অসঙ্গত ও অন্যায় ইঙ্গিত ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকায় স্থান পাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেছি।

শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় লিখিয়াছেন যে শাক্যসিংহ, ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষও সকলের নিকট মাননীয় হইতে পারেন নাই। (২৫৮ পৃঃ) তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে "অজ্ঞতা" বা "শিক্ষা ও রুচি" অনুসারে এরূপ হইয়া থাকিতে পারে এবং এ কথাও বলিয়াছেন যে "বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি··· কেনই যে অনুরাগ যায় না, তাহার কারণ সব স্থলেই যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, এমন নহে।"

স্বীকার করিতেছি যে অন্যান্য মহাপুরুষের ন্যায় রবীন্দ্রনাথও সকলের নিকট মাননীয় হইতে পারেন নাই। এ কথাও স্বীকার করিতেছি যে অজ্ঞতাবশতঃ অথবা শিক্ষা ও রুচি অনুসারেই এরূপ হইয়াছে, অথবা আদৌ কোনো কারণ নাই। সুতরাং কেহ কেহ যদি রবীন্দ্রনাথকে সম্মান করিতে না পারেন তবে সে সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই; রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মত প্রদান করিতেও কেহ তাঁহাদিগকে বাধা দিবে না। কিন্তু আমি নিজে সম্মান করিতে পারিব না বলিয়া অপরের সম্মান প্রদর্শনে বাধা দিব, এ কিরূপ কথা?

আর একটি কথা বলিব; শ্রদ্ধেয় পত্রপ্রেরক মহাশয় লিখিয়াছেন "কিন্তু যাঁহাদের হৃদয়ে ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি সে ভাবের শ্রদ্ধাভক্তি নাই, তাঁহাদিগকে তাহা বাহিরে দেখাইবার জন্য বাধ্য করার মূল্য কি?" (১৬২ পৃঃ) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্য নির্বাচন করিলেই যে শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় বা অপরাপর আপত্তিকারীগণের সকলেই রবীন্দ্রনাথকে বাহিরে (অথবা মনে) শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাইবেন তাহা আমরা কখনও ভাবি নাই। সম্মানিত সভ্য

তাঁহার জীবনের কথাও জানি; কিন্তু আমি তাঁহার মধ্যে ব্রাহ্মধর্মবিরোধী কিছু দেখি নাই। আমার মতে রবিবাবু ব্রাহ্ম এবং আরো কিছু যাহা ব্রাহ্মত্বের অবিরোধী, এবং আমি যতটুকু খবর রাখি তাহাতে রবিবাবু অপেক্ষা অধিক নানাদেশব্যাপী আধ্যাত্মিক প্রভাব জীবিত অন্য কোন মানুষের নাই।"

আরেকটি কথা পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ সামাজিক উপাসনা প্রণালীর বিরোধী নহেন। গত ১২ বৎসরের উপর তিনি নিয়মিতভাবে প্রতি বুধবার শান্তিনিকেতন আশ্রমে সকলকে লইয়া একত্র সামাজিকভাবে উপাসনা করিয়া আসিতেছেন।

নির্বাচনের পরেও বাহিরে (এবং মনে) শ্রদ্ধা না দেখাইবার এমন কি অশ্রদ্ধা দেখাইবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ইঁহাদের থাকিবে ; তবে ইঁহাদের উপর "জুলুম, দারুণ অত্যাচার, অতি ভীষণ মর্মান্তিক ব্যবহার" কোথায় করা হইতেছে বুঝিলাম না।

আর বেশি আলোচনা করিবার সময় নাই, আশা করি আবশ্যকও হইবে না।

শ্রদ্ধেয় পত্রপ্রেরক মহাশয় লিখিয়াছেন যে "শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয়··· সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়া সমাজের কার্যনির্বাহক সভায় পত্র লিখিয়াছেন।" (২৫৭ পৃঃ) ইহা চারিমাস পূর্বের কথা। কার্যনির্বাহক সভা সে পত্র গ্রহণ করিতে অসমর্থ এইরূপ জানাইয়া পত্রখানি ফেরৎ দিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় নবদ্বীপ বাবুও তাঁহার পদ-ত্যাগপত্র পুনরায় প্রেরণ করিবেন না বলিয়াছেন। অতএব শ্রদ্ধেয় নবদ্বীপবাবু সমাজের সংস্রব পরিত্যাগ করিবেন এরূপ আর কোনো সম্ভাবনা নাই, ইহা খুব স্পষ্ট করিয়াই সকলকে জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয়কে "পরিত্যাগ করা" "বিদায় করা" প্রভৃতি বাক্য এই পত্রে বারংবার ব্যবহার করা হইয়াছে। (২৬১ পৃঃ) প্রচারক মহাশয়কে বিদায় করিবার কোনো কথা কখনো উঠে নাই ; আমরা শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয় ও রবীন্দ্রনাথ দুইজনকেই চাই। কাহাকেও পরিত্যাগ করিবার আবশ্যকতা নাই। শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয়ের "সরিয়া দাঁড়াইবার" কোনো সম্ভাবনা নাই, শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক মহাশয় কি তাহা জানেন না ? অস্পষ্ট ইঙ্গিতে লোকের মনে সহজেই ভীতি সঞ্চার হইতে পারে।

তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়ের টিপ্পনী

শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য নিয়োগ করিবার প্রস্তাব সমর্থন করিয়া তত্ত্বকৌমুদীতে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। এই পত্রের বহুস্থলে সম্পাদকীয় টিপ্পনী (editorial note) করা হইয়াছে। কয়েকটি টিপ্পনী অতি মারাত্মক—সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক।

১. টিপ্পনী :—"পূর্ব বৎসর বার্ষিক সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে বিবিধ প্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও* প্রস্তাবের পক্ষে কেবলমাত্র চারিটি (কি ছয়টি) ভোট বেশী হইয়াছিল।"

* বিবিধপ্রকার চেষ্টার একটি নমুনা :—রবীন্দ্রনাথের নিকট আপত্তিকারী-

আমি সভায় উপস্থিত ছিলাম এবং স্বয়ং "ভোট" গণনা করিয়াছিলাম (সে সময়ে আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন সহকারী সম্পাদক ছিলাম)। আমার যতদূর স্মরণ হয় ৫১টি ভোট রবীন্দ্রনাথের স্বপক্ষে ও ২৯টি ভোট বিপক্ষে হইয়াছিল। ৫১ হইতে ২৯ বাদ দিলে চার (এমন কি ছয়ও) হয় না।

এ বৎসর ২২শে জানুয়ারির সভায় (অর্থাৎ আপত্তিকারী দ্বাদশজন বিশিষ্ট সভ্যের পত্র প্রকাশিত হইবার পূর্বে) মফঃস্বল হইতে ১৪২টি ভোট স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে মাত্র ২৮টি ভোট আসিয়াছিল।

২. সতীশবাবু লিখিয়াছেন :—"কেহই তাঁহাদের আপত্তির··· হেতু প্রদর্শন করিতেছেন না ; এবং এ বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রস্তুত হইতেছেন না।"

সম্পাদক মহাশয়ের টিপ্পনী :—"কমিটিতে বহুবার তাঁহারা আপত্তির কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। আলোচনা করিতেও প্রস্তুত আছেন।"

৯ই ডিসেম্বর তারিখে যেদিন কার্যনির্বাহক সভায় রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য রূপে নির্বাচন করিবার জন্য প্রস্তাব করা স্থির হয়, সেদিন কমিটিতে শ্রদ্ধেয় সতীশ বাবু সমস্তক্ষণ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। কমিটিতে কি আলোচনা হইয়াছিল তাহা সতীশবাবু যাহা জানেন তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় তাহা অপেক্ষা অধিক কিছুই জানেন না।*

৩. "বিবেক ও ধর্মবুদ্ধির" কথা উত্থাপন করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য নির্বাচন করা হইলে তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়ের বিবেক ও ধর্মবুদ্ধিতে আঘাত লাগিবে—ইহাই কি বলা তাঁহার উদ্দেশ্য ? তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় প্রস্তুত থাকিলেও এসম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শন বা আলোচনা করেন নাই।

৪. "অজ্ঞাত সত্যজ্ঞান"—ইহার কোনো অর্থ হয় কি ? অজ্ঞাত কারণ অনেক সময়ে কারণহীনতারই নামান্তর মাত্র।

৫. টিপ্পনী :—সভাপতি, সম্পাদক, সহঃ সম্পাদক ও অন্যান্য সভ্যগণ "কি কারণে স্বীয় স্বীয় পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের পদত্যাগ পত্রেই স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।"

গণের পক্ষ হইতে পত্র গিয়াছিল যে তিনি আসিয়া আমাদের সমাজে ঝগড়া বাধাইতেছেন কেন ! এ বৎসরের চেষ্টার নমুনা পরে (৪৬ পৃষ্ঠায়) দেখিবেন।

* তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় কি জানেন না যে শ্রদ্ধেয় নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় স্পষ্ট লিখিয়াছিলেন যে তিনি এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবেন না ?

তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় কার্যনির্বাহক সভার একজন সভ্য এবং এই পদত্যাগকারীদিগের মধ্যেও একজন বটে। পদত্যাগের কারণ সম্বন্ধে নানা প্রকার ভুল ধারণা প্রচারিত হইয়াছে। শুধু পদত্যাগ পত্রে নহে তত্ত্বকৌমুদীতেও কারণগুলি স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইলে ভাল হইত।

আমরা পদত্যাগের কারণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতেছি।

কর্তৃপক্ষদের পদত্যাগ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ৪ জন কর্মচারী ও কার্যনির্বাহক সভার ৯জন সভ্য পদত্যাগ করিয়াছেন; এই সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভুল ধারণা মফঃস্বলে রাষ্ট্র হইয়াছে। আমরা আসল পদত্যাগপত্র ছাপাইয়া দিতেছি।

অন্নদাবাবুর পত্র

সসম্মান নিবেদন,

নানাকারণে (তন্মধ্যে সময়াভাবও একটি প্রধান) আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে আমার নাম প্রস্তাব হইলে আপত্তি করিয়াছিলাম; আপত্তি সত্ত্বেও নির্বাচিত হইয়াছিলাম। সভায় বসিয়াই পদত্যাগ করিয়াছিলাম। তৎপরে কোন কোন ভক্তিভাজন সভ্যের উপদেশে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করি। আমার কাজ করিবার মোটেই সময় নাই, শক্তিও নাই। তারপর নানাকারণে ঘটনার পরে ঘটনায় প্রাণে আঘাত পাইতেছি। আমার ন্যায় দুর্বল ব্যক্তির পক্ষে কিছুকাল কার্যক্ষেত্র হইতে দূরে থাকাই আমার আত্মার পক্ষে মঙ্গল হইবে মনে করি। সুতরাং অনেক চিন্তার পর এই পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করিলাম। আমি কাজে যুক্ত থাকিতে পারিব না বলিয়া কষ্ট অনুভব করিব বটে কিন্তু এই পদত্যাগ করা ব্যতীত আর আমার উপায়ান্তর নাই। পুনর্বিচার করিতে অনুরোধ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা বিধেয় নহে।

বিনীত নিবেদক

(স্বাঃ) শ্রীঅন্নদাচরণ সেন।

মন্তব্য :—এই পদত্যাগ পত্রে রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি।

হরকান্তবাবুর পত্র

ভক্তিভাজনেষু,

গত পরশ্ব দিবস শ্রদ্ধেয় অন্নদাবাবুর পদত্যাগের চিঠির সঙ্গে আমি যে আপনাকে চিঠিখানা লিখিয়াছি তাহার প্রার্থনা গ্রহণ করিয়াই আমাকে দয়াপূর্বক সমাজের সম্পাদকীয় কার্যভার হইতে মুক্তিপ্রদান করিবেন। আমার এ বিষয়ে মনের ভাব গতকল্যও আপনাকে যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছি।

গতবৎসর বার্ষিক সভায় অভাবনীয় ও অযাচিতভাবে সম্পাদকের কার্যভার-প্রাপ্ত হইয়া ইহার ভিতর বিধাতার একটি বিশেষ ইচ্ছা অনুভব করিয়াছিলাম; এবং এই ভাবের দ্বারাই পরিচালিত হইয়া একটি বৎসর নানা বাধা বিঘ্ন ও অসুবিধার মধ্যেও কাজ করিয়াছি। এক্ষেত্রে আমার কর্তব্য শেষ হইয়াছে। সমাজের সম্মুখে যে সমস্ত গুরুতর সমস্যা অনিবার্যভাবে আসিয়া পড়িতেছে তৎসংক্রান্ত গুরুভার বহনে আমার ক্ষুদ্রশক্তি অসমর্থ। এবং বর্তমান প্রচণ্ড আন্দোলনের মধ্যে আমার চিত্তে স্থৈর্যরক্ষা করাও অসম্ভব। সম্প্রতি সার পি, সি, রায়, বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সমাজের আটজন বিশিষ্ট ব্যক্তি একযোগে প্রত্যেক সভ্যের নিকট যে চিঠিখানা প্রেরণ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল। এমতঅবস্থায় সমাজের কোনোপ্রকার কাজের সহিত আর নিজকে যুক্ত রাখা উচিত মনে করিতেছি না। উপসংহারে ইহা স্পষ্ট করিয়া জানাইতেছি যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সমাজের "সম্মানিত সভ্য" নিয়োগ প্রস্তাবের সহিত আমার পদত্যাগের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই।

ইতি একান্ত অনুগত

(স্বাঃ) শ্রীহরকান্ত বসু।

মন্তব্য :—রামানন্দ বাবুদের চিঠির উল্লেখ আছে, এ সম্বন্ধে আলোচনা পরে করিয়াছি। হরকান্তবাবু স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য নিয়োগ প্রস্তাবের সহিত তাঁহার পদত্যাগের কোনো সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই।

নরেন্দ্রবাবুর পত্র

শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় আমার নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বলিয়াছেন "রবীন্দ্রনাথের সহিত আমার পদত্যাগ পত্রের কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই; আমি বরাবর রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য নির্বাচনের পক্ষে

ভোট দিয়া আসিয়াছি, এবং ভবিষ্যতেও নির্বাচনের পক্ষেই ভোট দিব।" সুতরাং তাঁহার পদত্যাগ পত্র আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। সময়াভাব তাঁহার পদত্যাগের প্রধান কারণ।

সভাপতির পত্র

Dear Brother,

At the adjourned Annual Meeting of the 28th January, the Secretary, on behalf of the Executive Committee of the S. B. Samaj withdrew the recommendation for election of Dr. Rabindranath Tagore as honorary member. As none but the Ex. Committee has the right according to the rule of the Samaj to recommend or propose the election of an honorary member I as President of the meeting declared the item in the Agenda withdrawn.

On this several members questioned the right of the Ex. Committee to withdraw and of the President to declare it withdrawn, created disorder, used insulting expressions and demanded that I should vacate the chair.

At the adjourned Annual meeting of the 26th February the same members who questioned the right of the Ex. Committee to withdraw its recommendation passed a resolution unanimously which says "The Ex. Committee having cancelled their resolution of the 6th January whereby they had withdrawn their recommendation of the 9th December 1920 and there being no constitutional difficultion as to the election or otherwise of Dr. Rabindranath Tagore as honorary member." etc.

As I find it difficult to conduct the business of the meetings of the Samaj peacefully according to its constitution, as many members have shown utter want of consideration for the dignity of the office I have the honour to hold, I beg to resign the offiice of the President.

Yours fraternally
(Sd.) KRISHNAKUMAR MITRA

মন্তব্য :—

১. এই পত্রখানি ২রা মার্চের পরে লিখিত হইয়াছে।

২. সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থগিত বার্ষিক সভার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে,

কিন্তু সমস্ত কথা বলা হয় নাই। পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক যে ২৮শে জানুয়ারি তারিখেই সভাপতি মহাশয় স্বয়ং তাঁহার ruling withdraw করিয়াছিলেন।

৩. প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবার অধিকার সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে ৭ জন আইনজ্ঞের মতামত জিজ্ঞাসা করা হয়। এই সাতজন একমত হইয়া পরামর্শ দেন যে referendum দ্বারা বিষয়টির নিষ্পত্তি করা হউক। এই পরামর্শ অনুসারে ২৬শে ফেব্রুয়ারির নির্ধারণ স্থির হয়।

৪. কৃষ্ণবাবু স্বয়ং এই ২৬শে তারিখের নির্ধারণে সম্মতিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শুধু ২৬শে তারিখে নয়, তাহার ৬ দিন পূর্বে, Mr. S. R. Das-এর বাড়িতেও (২০শে ফেব্রুয়ারি) তিনি এই নির্ধারণ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

৫. তাঁহার পদত্যাগের একমাত্র কারণ দিয়াছেন এই যে অনেক সভ্য রূঢ় ব্যবহার করিয়াছেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে কোনও প্রকার গোলমাল হয় নাই, একজন সভ্যও অশান্তির সৃষ্টি করেন নাই, বা অপমানজনক বাক্য ব্যবহার করেন নাই। যাহা কিছু গোলমাল সমস্তই ২৮শে জানুয়ারি তারিখেই হইয়াছিল। তবে ২৮শে জানুয়ারির পরেই পদত্যাগ না করিয়া একমাস পাঁচদিন অপেক্ষা করিলেন কেন? এবং যদি অপেক্ষাই করিলেন, তবে ১৯শে মার্চের নির্বাচন তারিখের মাত্র ১৬ দিন পূর্বে পদত্যাগ করিলেন কেন?

কার্যনির্বাহক সভার পদত্যাগ

সবিনয় নিবেদন

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি কয়েকজন শ্রদ্ধেয় বন্ধুর স্বাক্ষরিত একখানা পত্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের আমাদিগের প্রতি অনাস্থা জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ, অনেকে এখন মনে করিতেছেন যে আমরা আপনাদিগের হস্তে সমাজের কার্য পরিচালনার ক্ষমতা রাখিতে দৃঢ়-সংকল্প। তৃতীয়তঃ, কিছুদিন হইতে দেখিয়া আসিতেছি যে যাঁহাদের সহিত আমাদের মতের অনৈক্য হয় যদিও আমরা তাঁহাদের সঙ্গে সাধ্যমত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে চেষ্টা করি, তথাপি পদে পদে তাঁহাদের দ্বারা আমাদিগকে ব্যাহত হইতে হয়। এইরূপ সংঘর্ষণে অনেক সময় নষ্ট ও শক্তিক্ষয় হইতেছে এবং আমাদিগকে অত্যন্ত অশান্তিভোগ করিতে হইতেছে। এই অবস্থায় আমরা

সমাজের কার্যনির্বাহক সভার সভ্য থাকিতে একেবারে অসমর্থ। সুতরাং আমরা এই পত্রদ্বারা উক্ত সভার সভ্যপদত্যাগ করিতেছি। ১লা মার্চ ১৯২১।

মন্তব্য :—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ প্রভৃতি আটজন সভ্য এই পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এই পত্রখানিতেও রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ নাই, এবং সম্মানিত সভ্য নির্বাচন সম্বন্ধেও কোনো কথা বলা হয় নাই।

মহাশয়,

শশীভূষণ দত্ত প্রমুখ ১২ জন সভ্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের নিকট একখানা পত্র প্রেরণ করেন। আমি এই ১২ জনের একজন।

অনেকে এই কথা বলিতেছেন যে আমরা আমাদের পত্রে স্পষ্টতঃ অথবা প্রকারান্তরে মিথ্যা কথা বলিয়াছি। আমার নিজের বিবেচনায় এরূপ অবস্থায় আমার কার্যনির্বাহক সভার সভ্য থাকা উচিত নহে। আমি উক্ত সভ্যপদ পরিত্যাগ করিলাম। আপনি অবিলম্বে অধ্যক্ষ সভায় আমার শূন্যপদ পূরণের বিজ্ঞাপন দিবেন।

বিনীত নিবেদক

৫ই মার্চ, ১৯২১। (স্বাঃ) শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ আচার্য।

মন্তব্য :—৩রা মার্চ কমিটির অধিবেশন হইয়া যাইবার দুইদিন পরে এই পদত্যাগ পত্র লিখা হয়। পরের সপ্তাহের জন্য অপেক্ষা পর্যন্ত না করিয়া, কোনো প্রকার আলোচনা না করিয়া circulation-এর দ্বারা এই পদত্যাগ-পত্রের বিজ্ঞাপন বাহির করা হইল।

পদত্যাগ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য নিয়োগ করা পদত্যাগের কারণ বলিয়া একখানি পত্রেও উল্লেখ করা হয় নাই। শ্রদ্ধেয় অন্নদাবাবু ও নরেন্দ্রবাবুর পদত্যাগের প্রধান কারণ সময়াভাব। এই দুইজন ও শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়ের পদত্যাগের কথা বাদ দিলে বাকী দশজনের পদত্যাগের সাক্ষাৎ কারণ এই যে সমর্থনকারী-দিগের কোনো এক বিশেষ বর্ণনাপত্র প্রকাশিত হওয়ায়, এই দশজনের সম্বন্ধে সভ্য সাধারণের মনে অনাস্থা জন্মিবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। বর্ণনাপত্রে যদি কোনো ভুল অথবা অন্যায় কথা বলা হইয়া থাকে, তবে তাহা তাঁহারা সহজেই দেখাইয়া

দিতে পারিতেন। ভুল প্রদর্শন করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের সম্বন্ধে অনাস্থা জন্মিবার আর কোনো সম্ভাবনা থাকিত না। কেহই বর্ণনাপত্রে কোনো ভুল হইয়াছে দেখাইলেন না অথচ পদত্যাগ করিলেন। এখনো পর্যন্ত কেহ একটিও ভুল প্রদর্শন করেন নাই, যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে বর্ণনাপত্রে ভুল নাই তবে বলিতে হইবে এই যে কর্তৃপক্ষগণ ন্যায্য ও সত্য সমালোচনাতেও বিরক্ত হইয়া একযোগে কার্য পরিত্যাগ করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথের নির্বাচন সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে ১৯শে মার্চ। তাহার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে সকলে একযোগে পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করায় মফস্বলে নানাপ্রকার ভুল ধারণা জন্মিয়াছে। মফস্বলে অনেকে মনে করিয়াছেন এই যে রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য নিয়োগ করিবার প্রস্তাবই পদত্যাগের কারণ। নির্বাচন সম্বন্ধে যে অবান্তর ও অসঙ্গত বাধা উপস্থিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। অনেকে একযোগে পদত্যাগ ব্যাপারে ভীত হইয়া রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ভোট দিতেছেন। কর্তৃপক্ষগণ যদি মাত্র আর দুই সপ্তাহ অপেক্ষা করিতেন তবে নির্বাচন সম্বন্ধে এইরূপ অন্তরায় উপস্থিত হইত না।

আরেকটি কথা বলা আবশ্যক। বর্ণনাপত্রে কার্যনির্বাহক সভার কোনো কার্যের সমালোচনা করা হয় নাই। তবে ইঁহারা কার্যনির্বাহক সভার সভ্যপদ ত্যাগ করিলেন কেন? কেহ পদত্যাগপত্র প্রেরণ করিলে এই পত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ করাই প্রচলিত রীতি। তবে ইঁহাদের সম্বন্ধে এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটিল কেন? ইঁহাদিগকে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য Committee অনুরোধ করিবার পূর্বে তাড়াতাড়ি কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির করা হইল কেন? আর এক সপ্তাহ অপেক্ষা করিলে কি কোনো ক্ষতি হইত?

কৃষ্ণবাবুর আরেকটি পত্র

৫ই মার্চ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

শশীবাবু, হেরম্ববাবু, প্রাণকৃষ্ণবাবু, সীতানাথবাবু, বরদাবাবু প্রভৃতি কার্য-নির্বাহক সভার সভ্য ও সম্পাদক হরকান্তবাবু, সহকারী সম্পাদক অন্নদাবাবু, নরেন্দ্রবাবু ও আমি পদত্যাগ করিয়াছি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে যদি রক্ষা করিতে হয় তবে অবিলম্বে এমন কিছু

করিবেন যাহাতে গিরিডি এবং অন্যান্য স্থানের আপনার পরিচিত ব্রাহ্মগণ রবিবাবুকে ভোট না দেন।

আপনার
(স্বাঃ) শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র।

মন্তব্য :—১. পত্রখানি গিরিডির একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নিকট লিখিত হইয়াছিল। তিনি এই পত্রখানি গিরিডির সভ্যগণের নিকট circulate করিয়া এই বিষয় আলোচনা করিবার জন্য একটি সভা আহ্বান করিয়াছিলেন।

২. পদত্যাগপত্রে যে সকল কারণের উল্লেখ আছে, তাহাই যদি পদত্যাগের প্রকৃত কারণ হয়, তবে শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণবাবুর পত্রখানি দ্বারা কি এরূপ ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই যে রবিবাবুকে সম্মানিত সভ্যরূপে নির্বাচন করাই পদত্যাগ পত্রের কারণ? এরূপ ধারণা জন্মিলে, নির্বাচন সম্বন্ধে অবান্তর ও অসঙ্গত বাধা উপস্থিত হইবার কি কোনো সম্ভাবনা নাই?

৩. ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে হইলে কেন রবিবাবুর বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া আবশ্যক, সে সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণবাবু কারণ প্রদর্শন করেন নাই।

৪. ব্যক্তিগত পত্র লেখা সম্বন্ধে আপত্তি নাই। কিন্তু পদত্যাগ ব্যাপারের উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করিতেছি না।

উত্তর প্রত্যুত্তর

১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে শ্রদ্ধেয় শশীভূষণ দত্ত প্রমুখ সমাজের ১২জন বিশিষ্ট সভ্য, রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য নির্বাচন করিবার বিরুদ্ধে একখানি পত্র প্রকাশিত করেন। তৎপরে, এই পত্রের সমালোচনা করিয়া সমর্থনকারীদিগের পক্ষ হইতে একখানি বর্ণনাপত্র ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রকাশ করা হয়। এই বর্ণনাপত্র যাঁহারা লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ছাপা হয় নাই। কিন্তু শ্রদ্ধেয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ৮জন সভ্য এই বর্ণনাপত্রের ভূমিকা স্বরূপ একটি covering letter লিখিয়া দিয়াছিলেন ৪ঠা মার্চ তারিখে, প্রথম পত্রের দ্বাদশজন স্বাক্ষরকারীর মধ্যে দশজন আরেকখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই পত্রে বলা হইয়াছে যে সমর্থনকারীদিগের "বৃত্তান্তে অনেক অমূলক ইঙ্গিত ও অভিযোগ আছে।" অথচ এই গুরুতর কথার সমর্থনে একটিও প্রমাণ বা যুক্তি উপস্থিত করা হয় নাই। আলোচনা না করিবার কারণ

দেওয়া হইয়াছে এইরূপ :—"বৃত্তান্ত লেখকদের নামও অজ্ঞাত সুতরাং আমরা ইহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করি না।" যাহার উত্তর দেওয়াই আবশ্যক মনে করেন না, তাহার উপর নির্ভর করিয়া পদত্যাগ করা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে?

এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবুর কথা নিম্নে ছাপিতেছি।

রামানন্দবাবুর বক্তব্য

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনারারি সভ্য নির্বাচন করিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে একটি বর্ণনাপত্রের প্রতি ঐ সমাজের সাধারণ সভ্যদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত যে চিঠিতে আমি স্বাক্ষর করিয়াছি, তাহা কিরূপে করিয়াছি বলা আবশ্যক। উক্ত বর্ণনাপত্র আমাকে আদ্যোপান্ত পড়িয়া শুনান হয়। শুনিবার সময় আমি স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তন ও সংযোগ করিতে বলি, এবং তাহা করা হয়। তদ্ভিন্ন আরও যে যে সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাপিবার পূর্বে করা হইবে তাহাও আমাকে জানান হয়। তাহার পর আমি পূর্বোক্ত চিঠিতে আমার নাম ছাপিতে অনুমতি দিয়াছিলাম। অনুমতি দিবার পূর্বে বা পরে আমার কোন সন্দেহ হয় নাই এবং এখনও কোন সন্দেহ নাই যে আমাকে যাহা জানান হয় নাই এমন কোন কথা বর্ণনাপত্রে সংযুক্ত হইয়াছে বা আমাকে যাহা জানান হয় নাই উহাতে এমন কোন পরিবর্তন করা হইয়াছে। বর্ণনাপত্রে লিখিত সমস্ত কথা প্রমাণ করিবার দায়িত্ব অবশ্যই লেখকদের; কিন্তু তাহা হইলেও আমার যদি সন্দেহ হইত যে উহাতে কোন অসত্য কথা আছে, তাহা হইলে আমি পূর্বোক্ত চিঠিতে স্বাক্ষর করিতাম না। আমি এখনও মনে করি না যে বর্ণনাপত্রে কোন অসত্য কথা আছে।

এই বর্ণনাপত্রের কেহ কোন উত্তর দিতে চাহিলে তাহা সহজেই করা যাইতে পারিত ও পারে। সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা এমন অনেক লেখা ছাপিয়া থাকেন যাহাতে লেখকের নাম থাকে না বা ছদ্মনাম থাকে; কিন্তু লেখকের নাম জানা না থাকিলেও লেখার প্রতিবাদ, ভ্রমসংশোধন বা উত্তর সম্পাদকের নিকট পাঠাইলেই কার্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। এক্ষেত্রেও বর্ণনাপত্রের প্রতিবাদ বা উত্তর দান, আমার নাম ও ঠিকানা জানা থাকায়, দুঃসাধ্য বা অসাধ্য ছিল না এবং

এখনও নহে। বর্ণনাপত্রে লেখকদের নাম না-থাকা একটা বাধা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইতি।

স্বাক্ষর

১৩ই মার্চ ১৯২১ শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

২১০-৩-১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আলোচনা সম্বন্ধে নিবেদন

নাম না-থাকা যদি আলোচনা করিবার পক্ষে একমাত্র অন্তরায় হয়, তবে সে বাধা দূর করিতে আপত্তি নাই। বর্ণনাপত্রের দায়িত্ব শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় ও আমি প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করিতেছি। যদি কেহ ইচ্ছা করেন বর্ণনাপত্র সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে আলোচনা করিতে পারেন। বর্ণনাপত্রের প্রতিবাদ অথবা ভ্রম প্রদর্শন করিয়া আমার নিকট পত্রও লিখিতে পারেন (আমার ঠিকানা নীচে পাইবেন)। আশা করি এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পক্ষে আর কোনো বাধা রহিল না।

আরেকটি কথা বলা কর্তব্য মনে করিতেছি। আজ পর্যন্ত কেহ আমাদের বর্ণনাপত্রে একটিও ভুল fact, একটিও ভুল প্রমাণ অথবা একটিও ভুল যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই অথবা করেন নাই।

আপত্তির কারণ

৬ঠা তারিখের পত্রে বলা হইয়াছে যে "শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সম্মানিত সভ্য নিয়োগ করিতে আমাদের যে আপত্তি আছে, কার্যনির্বাহক সভাতে পুনঃ পুনঃ সে আপত্তির কারণ ব্যক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এ সকল ব্যক্তিগত কথা ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে কিংবা সাধারণ সভাতে আলোচনা করা আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি না।"

কার্যনির্বাহক সভায় গত দুই বৎসরের মধ্যে যে কয়দিন এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়, আমি স্বয়ং সমস্তক্ষণ সভায় উপস্থিত ছিলাম। রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য নিয়োগ করিলে "কেহ কেহ প্রাণে গভীর ক্লেশ ও যাতনা অনুভব করিবেন," এই কারণটিকেই নানা ভাষায়, নানা আকারে, নানা প্রকারে বারংবার ঘুরাইয়া

ফিরাইয়া আলোচনা করা হইয়াছে*। এই কারণটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত—"রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য করিলে কাহারো কাহারো মনে গভীর যাতনার উদ্রেক হইবে"—এইরূপ ব্যক্তিগত কথা লইয়া অধিক আলোচনা করা আমরাও বাঞ্ছনীয় বা সমাজের পক্ষে গৌরবজনক মনে করি না। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক যে কার্যনির্বাহক সভায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোনো প্রকার ব্যক্তিগত আলোচনা হয় নাই; হইয়াছিল শুধু কাহারো কাহারো ব্যক্তিগত গভীর যাতনার কথা।

এ স্থলে আরেকটি কথাও খুলিয়া বলা প্রয়োজন। দশজন স্বাক্ষরকারীর মধ্যে অধিকাংশ (অর্থাৎ অন্ততঃ ছয়জন) রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নিজেদের কোনো আপত্তির কথা কখনো প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাদের একমাত্র আপত্তি সেই "অমুক অথবা অমুকের প্রাণে গভীর ক্লেশ।"

বর্তমান অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এখন যদি রবীন্দ্রনাথ সম্মানিত সভ্য নির্বাচিত না হন তবে তাঁহার প্রতি নিতান্ত অসম্মান প্রদর্শন করা হইবে। তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিলে কাহারো কাহারো মনে ক্লেশ হইবে; কিন্তু তাঁহার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিলে কি তাহা অপেক্ষা অধিক লোকে মনে ক্লেশ পাইবেন না? শ্রদ্ধাপ্রকাশের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে বাধা দিয়া কি সমাজের মঙ্গল হইবে?

কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই

দীর্ঘ আলোচনা ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে। শেষ করিবার পূর্বে মূল বক্তব্যটিকে পুনরায় স্মরণ করা আবশ্যক।

আমরা দেখিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বিশ্বমানবকে লইয়া একটি বিরাট সার্বভৌমিকতার আদর্শ গড়িয়া তুলিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমিকতা স্বাতন্ত্র্যকে পরিহার করে নাই, জাতীয়ত্বকে বর্জন করে নাই, বৈচিত্র্যকে বিসর্জন দেয় নাই। রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমিকতার মূল মন্ত্র—বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন। এই একমেবাদ্বিতীয়মের সাধনাকেই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত তপস্যা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসেও আমরা এই এক মূল আদর্শ দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথ নিজে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে ব্রহ্মসাধনার এই সার্বভৌমিক

* বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত সভ্য নিয়োগ করিলে কেহ কেহ কেন যে গভীর যাতনা অনুভব করিবেন তাহার কোনো কারণ প্রদর্শন করা হয় নাই।

আদর্শটিকে বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করাই ব্রাহ্মসমাজের চরম সার্থকতা। তাই রবীন্দ্রনাথের বাণী ব্রাহ্মসমাজেরই বাণী।

রবীন্দ্রনাথের গানে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাস-প্রবন্ধ ও ধর্মোপদেশে তাঁহার সুমহান আদর্শ প্রকাশিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিদিনের জীবনে তাঁহার নানা বিচিত্র প্রতিষ্ঠানে, তাঁহার সমগ্র কর্মচেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের সাধনা সত্য হইয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবন্ত আদর্শের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে নূতন প্রেরণা আসিয়াছে, এই জন্যই আমরা রবীন্দ্রনাথকে চাই।

রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করা সম্বন্ধে যে আপত্তি উঠিয়াছে তাহাকে আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না, তাহাকে আমরা অশ্রদ্ধাও করিব না। এই আপত্তির মধ্যে আমরা ব্রাহ্মসমাজের বিপদসঙ্কুল অতীত ইতিহাসের পরিচয় পাইতেছি। কঠিন সতর্কতার সহিত অন্যকে পরিহার করিয়া চতুর্দিকের বাধা বিপত্তি প্রলোভনের মধ্যে কঠোর আত্মপরায়ণ শুচিতা তাহার নির্মম রিক্ততা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজকে একদিন রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু আজ সেই সঙ্কীর্ণতার প্রয়োজন ঘুচিয়া গিয়াছে। সেই জন্যই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণের আপত্তিকে শ্রদ্ধা করিব, কিন্তু একান্ত করিয়া দেখিব না। ব্রাহ্মসমাজে "না"-এর মাপকাঠি দিয়া বিচার করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে; মানুষ কি করিতে পারে নাই, কোথায় তাহার অভাব পড়িয়াছে এ সমস্তই ছোট কথা। সে কি করিয়াছে, সে কি দিয়াছে, ইহাই বড় কথা।

আমরা দেখিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আপত্তি প্রায় সমস্তই ভ্রান্ত ধারণা হইতে প্রসূত। তথাপি বলিব না যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোনো দোষ ত্রুটি নাই। কারণ আমাদের মাপকাঠির বিচারে তিনি নির্দোষ কি না ইহাই বড় কথা নহে। তাঁহার দোষ ত্রুটি আছে স্বীকার করিয়া লইতেছি। কিন্তু তাঁহার সমস্ত দোষ ত্রুটি অপেক্ষা তিনি বড় বলিয়াই তাঁহাকে চাই।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে আজ "নেতি" হইতে "ওঁ ইতি"তে যাইবার দিন আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বাণী এই নূতন যাত্রাটিকে সূচনা করিতেছে, তাই আমরা রবীন্দ্রনাথকে চাই। তাঁহার এই বাণী শুধু একটি আদর্শ মাত্র নহে, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের মধ্যে ইহা মূর্ত। তাই, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে মানুষ সেই মানুষটিকেই আমরা চাই। আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রীতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা চাই।

১৫ই মার্চ, ১৯২১ শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ

২১০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গোত্রান্তরের গল্পকার সুবোধ ঘোষ

অলোক রায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে সুবোধ ঘোষের প্রথম তিনটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়: 'ফসিল', 'পরশুরামের কুঠার', 'শুক্লাভিসার'। জীবনে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে সুবোধ ঘোষের আবির্ভাব। কিন্তু যেটা বিস্ময়কর তা হলো প্রথম থেকেই তাঁর ভাষা পরিশীলিত ও সংকেতময়, প্রয়োজনে আবেগ-বর্জিত তীক্ষ্ণতা অর্জনে সক্ষম; আর ছোটগল্পের নিখুঁত শিল্পরূপটি তাঁর করায়ত্ত, সামান্য চমকের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ কাহিনী একমাত্র পরিণামের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু সুবোধ ঘোষ সাহিত্যজীবনের সূচনায় শুধু গল্প বলে তৃপ্তি পান নি, গল্পের মধ্য দিয়ে আরও কিছু বলতে চেয়েছেন—সেই পরিবর্তনের কথা, যার সঙ্গে দেশকালের যোগ প্রকট। 'পরশুরামের কুঠার' যদিও ধনিয়ার কাহিনী, কিন্তু এ তো শুধু ধনিয়ার কাহিনী নয়; 'নয়াবাদ' আসলে নতুন নগরপত্তন ও নতুন মূল্যবোধের স্মারক: 'তারপর সুরু হলো নয়াবাদের একটানা ও অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তন। যেন একটা দুর্বার আবেগ রাতের রেলগাড়ির মতো নয়াবাদকে টেনে নিয়ে গেল বছরের পথ ধরে, হু হু করে, পরিণামান্তরে। নয়াবাদের অনেক কিছুই বদলে গেল।' ('শ্রেষ্ঠ গল্পে'র পাঠ এখানে গ্রহণ করা হয়েছে যা প্রথম পাঠ থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র)। এই পরিবর্তনের স্রোতেই ভেসে গেছে "ফসিল" গল্পের নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড়। 'ফিউডাল দেমাকে অন্ধ আর ইজ্জতের কমপ্লেক্সে জর্জর' মহারাজা প্রথমে পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারেন নি, কারণ 'নতুন প্রাণের জোয়ারের সঙ্গে' অঞ্জনগড়ে এলো বিদেশী বণিকের মাইনিং সিণ্ডিকেট। বাধলো সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের বিরোধ। হয়তো এই বিরোধের চিত্র একালের অন্যান্য গল্প-উপন্যাসেও পাওয়া যাবে, কিন্তু তারাশঙ্কর বা অন্য অনেকের মতো সুবোধ ঘোষ একে কেবল প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব হিসাবে দেখেন নি। শক্তি ও প্রতিপত্তির অর্থনৈতিক বনিয়াদ যে শোষণের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তা রাতারাতি পালটায় না; তাই মহারাজা ও গিনসন সহজেই চুক্তিতে আসতে পারে—সেখানে শ্রেণীস্বার্থের

ভূমিকা অনস্বীকার্য। অন্যদিকে আদর্শবাদী ইতিহাস-পড়া মুখার্জী হাজার চেষ্টা করেও তার মার্কিনী ডেমোক্রেসির আদর্শ সফল করতে পারে না, বরং সেই-ই নিজের অজ্ঞাতসারে কুর্মিশ্রমিকদের সর্বনাশ করে। সুবোধ ঘোষ এর মধ্যে দেখেছেন ইতিহাসের অঙ্গুলি-সংকেত, ফসিলে পরিণত মানুষের ভবিষ্যৎ।

"ফসিল" মুখার্জীর গল্প নয়। তাছাড়া মধ্যবিত্তের আত্মসংকট সেখানে থাকলেও তার প্রতিক্রিয়াশীল রূপ সেখানে স্পষ্ট নয়। 'গোত্রান্তর' মধ্যবিত্ত মানসিকতার দৈন্য ও লোভকে নির্মমভাবে তুলে ধরেছে। এম. এ. ডিগ্রীধারী বেকার সঞ্জয়ের দৃষ্টিতে 'এখানে [পরিবারে] প্রত্যেকটি স্নেহ পণ্য মাত্র। প্রত্যেকটি আশীর্বাদ এক একটি পাওনার নোটিস।··· ওপর থেকে দেখতে কী সুন্দর! মা, বাপ, ভাই, বোন, আপনজন, আত্মীয়তার নীড়। কত গালভরা প্রবচন! একটু আঁচড় দিলেই চামড়া ভেদ করে দেখা দেয় নির্লজ্জ মহাজনের মাংস।··· তবে এ তত্ত্ব নতুন কিছু নয়। ইতিহাসের শিরায় শিরায় এই রীতি গড়িয়ে আসছে বহু হাজার বছর ধরে। সেই গুহা-মানবের গৃহধর্ম থেকে সুরু করে মকতপুরের দত্তবাড়ীর সংসারকলা।' তারপর রতনলাল সুগার মিলে তিরিশ টাকা মাইনের ক্যাসমুন্সীর পদলাভ, আর জীবনের সর্বক্ষেত্রে শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রবল ক্রোধ থেকে কিষাণদের সংগ্রামী আন্দোলনে নেতৃত্ব দান : 'তার অপমানিত প্রতিভা যেন ব্যর্থ রোষে ফণা নামিয়ে দিন গুণছিল। এইবার ফিরে ছোবল দিতে হবে, যতখানি বিষ ঢালতে পারা যায়।' কিন্তু 'গোত্রহীন মানুষ' নেমিয়ারের বিশ্বাস সঞ্জয় রক্ষা করতে পারে না—সে বিশ্বাসঘাতকতার পরিবর্তে ভালো রকম পুরস্কার পায়—ইমানদারের ইনাম। গল্পের শেষে গেরস্তর মুর্গি চুরি করে খাওয়া শেয়ালের গোঁফের রক্ত চাটার সঙ্গে সঞ্জয়ের তুলনা বড়ো মর্মান্তিক—কিন্তু মধ্যবিত্তের গোত্রান্তরের চেষ্টার বৈফল্য এরই ফলে যেন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

"শুক্লাভিসার" গল্পের পুষ্কর মিত্রও উঁচু থেকে নিচে নামার চেষ্টা করেছে, কিন্তু মধ্যবিত্ত চরিত্র অতিক্রম করতে পারে নি। সে সঞ্জয়ের মতো দরিদ্র নয়, অথচ একই রকম বিশ্বাসঘাতক, সন্তানসম্ভবা বরুত্রীকে ফেলে সে চলে গেছে। অন্যদিকে দেবল ত্রিপাঠী সেকেলে জায়গীরদারের সন্তান হলেও মজুরদের সেবায় আত্মনিয়োজিত—জেলেও যায়। পুষ্করের একেবারে বিপরীত জাতের চরিত্র। সে শুধু বরুত্রীকে উদ্ধার করে না, বোঝা যায় মানুষকে উদ্ধার করার চাবিকাঠি তার হাতে। এখানে শ্রেণীচরিত্র দিয়ে মানুষকে বিচার করা যায় না। হয়তো

সুবোধ ঘোষ ত্রিপাঠীকে অনেকটাই আদর্শায়িত করেছেন। হয়তো অতীতের জন্য একটা প্রচ্ছন্ন মোহ লেখক কথনোই কাটাতে পারেন নি।

সন্দেহ প্রবল হয় "ন তস্থৌ"-র মতো গল্প পড়ে। উপাধ্যায় অতীতকে ধরে রাখতে চান, নানা ধরনের পিছুটান তাঁর মধ্যে প্রবল, কিন্তু সপ্তাবরণ বিষ্ণু মন্দিরের ভগ্নস্তূপ আর আধুনিকার প্রণয়াভিলাষী পুত্র সোমনাথ—কাকে রাখবেন তিনি? সোমনাথও কখনো নিশির ডাকে পিছন ফিরে তাকায়, 'কিন্তু নিশির ডাকের এই আবেশ আর কতক্ষণ? ঐ যে চাঁদ ডুবে গেল, দিনের আলোকে আবার মাটি হয়ে যাবে এই রূপময় অতীত।' ('শ্রেষ্ঠ গল্পে'র পাঠ)। আসলে লেখক বারবার স্মরণ করিয়ে দেন, 'কী নিষ্ঠুরভাবে বদলে যাচ্ছে পৃথিবী!' তাই সোমনাথ গ্রাম ছেড়ে স্টেশনের দিকে অগ্রসর হয়। আর, 'কল্যাণঘাটের এক বিকলাঙ্গ বিগ্রহের মতো থামের গায়ে কাৎ হয়ে বসে রইলেন উপাধ্যায়। নির্বোধের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন স্টেশনের পথের দিকে।' এই ভাবেই যেন অন্যায়ের প্রতিরোধে অক্ষম কড়ে খাঁ অসহায়ের মতো বসে পড়ে, 'যেন জরাগ্রস্ত, লোলচর্ম, শ্লথবিগলিত পেশী এক আশীতিপর বৃদ্ধের শব কুঁকড়ে পড়ে আছে বারান্দার কোণে।' ("নির্বন্ধ")।

ভাট তিলক রায় অন্যভাবে অতীতের মহিমাগানের মধ্য দিয়ে অতীতকে ধরে রাখতে চায়। কিন্তু নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার সুযোগও তো তাকে দেওয়া হয় না। নিমিয়াঘাটে লালকি নদীর বাঁধের কাজে সে প্রথমে বাধা দিয়েছে সত্য, কিন্তু পরে কুর্মিকুলিদের নিয়ে সে শুধু বাঁধের কাজ করে নি, শ্রমিকদের স্ট্রাইকের বিরোধিতা করেছে। সে ভুল করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাকে ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে নিজের জীবন দিয়ে। নতুন মেশিনের প্রথম আঘাত নেমে এলো তিলক রায়ের উপর—বিনা দোষে কোম্পানি তাদের সর্বনাশ করে দিল। তিলক রায় বুঝলো তার সেই পুরনো বিশ্বাসই সত্য—এই বাঁধ এই যন্ত্রদানব মানুষের শত্রু। 'ভাট তিলক যেন সত্যিই ইতিহাসের একটা বৃদ্ধ আক্ষেপের প্রেতের মতো। যথের মতো অতীতের যত অভিমান পাহারা দিত। বহুরূপী হয়ে সে আমাদের বর্তমানকে ব্যঙ্গ করত। ভবিষ্যৎকে সে সইতে পারল না। তার সংশয়টা শেষ পর্যন্ত সে চরম বলে জেনে গেল। তিলক রায় যেন আদিম পৃথিবীর সেই চণ্ড ও সরল আত্মা, ক্যাপিটাল আর ইণ্ডাষ্ট্রি আর মেশিনের অবুঝ মারের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করে সে ফুরিয়ে গেল।'

ধ্রুবেশও লড়াই করেছে, অভাব অনটন দারিদ্র্যের সঙ্গে—যুদ্ধের সময় বোমা

পড়ার ভয়ে স্কুলে ছাত্র নেই—চল্লিশ টাকা মাইনের ইতিহাসের শিক্ষক ধ্রুবেশের চাকরি গেছে। কিন্তু "কর্ণফুলির ডাক" আসলে ধ্রুবেশের গল্প নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে জাপানিরা এগিয়ে আসছে, বোমার আতঙ্কে কলকাতা থেকে লোকে পালাচ্ছে, এরই মধ্যে ধ্রুবেশের ভাবনা, 'স্বার্থে ও সর্বার্থে সংঘাত বেধেছে। এই অভ্যুদয়ের যজ্ঞে পুড়ে যাচ্ছে জাতিবাদ, অর্থনীতির অনর্থ, প্রতাপের মূঢ়তা, পরস্ব শোষণের রসনা। সাম্রাজ্যের চর্বি গলে যাচ্ছে। ধূলিসাৎ হয়ে পড়েছে ফাসিস্তি স্পর্ধার চূড়া।' কিন্তু সে সময়ও অধিকাংশ মানুষ যুদ্ধ নিয়ে ভাবতে রাজি নয়, সকলেই আত্মচিন্তায় মগ্ন : 'সকলেই ঝুড়ি ঝুড়ি কর্তব্য আর দাবীর পসরা মাথায় নিয়ে বসে আছে—যুদ্ধের পরে। মাসীমা যুদ্ধের পরেই বীণার বিয়ে দেবেন। পেট্রিয়টেরা যুদ্ধের পর এক হাত লড়বেন—যারা জিতবে তাদের সঙ্গে। মহাবণিক সঙ্ঘ আজ থেকেই ছটফট্ করছে যুদ্ধের পরে কে কত বড় কারবার ফলাবে।' অবশ্য ধ্রুবেশের উত্তেজনাও অনেকটা উদ্দেশ্যহীন, তার বক্তৃতা বাক্‌সর্বস্ব উচ্ছ্বাস মাত্র। হয়তো তখনো সোভিয়েট রাশিয়া আক্রান্ত হয় নি, তখনো সাম্যবাদী দলের যুদ্ধ সম্বন্ধে স্পষ্ট মতামত দেওয়ার সময় আসে নি। তবে তখনই ধ্রুবেশকে লোকের মনে হয়েছে স্পাই বা ইংরেজের পা-চাটা। এর মধ্যে কর্ণফুলির তীরে চট্টগ্রামে তার ফেলে আসা গ্রাম বিরাজপুরে বোমা পড়ার খবর কিভাবে ধ্রুবেশকে ভবিষ্যৎ পথ দেখাবে তা বোঝা যায় না, তবে প্রতিরোধের ভাবনাটুকুও যে সে সময় মূল্যবান ছিল, তাই লেখকের মন্তব্য, 'কালনাগের মত দুস্‌মনের পথ রুখে দাঁড়ালো যে নওজোয়ানের দল। বিরাজপুরের ধূলিকুটিমে যে হার-না-মানা অবুঝেরা নিজের হাতে সাজিয়ে রাখলো ভয়াল মরণবাসর। শত্রুর চণ্ড অভিযান থমকে যাবে নিশ্চয়, ঐ কাঠের পুলের কাছে—অন্তত কিছুক্ষণের জন্য। আর—শতাব্দীর সিঁথির মত বিরাজপুরের ঐ সড়কে হয়তো মুখ থুবড়ে পড়বে বুলেটের আঘাতে শতদীর্ণ এক ইতিহাসের মাস্টারের শোণিতাক্ত চুম্বন।'

ধ্রুবেশ জানতো না কার সঙ্গে তার লড়াই। "চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ" গল্পের ষ্টিফেন হেরো প্রতিপক্ষের স্বরূপ জানে। লেখক নিজে হয়তো এখানে একটু বেশি ব্যাখ্যাপ্রবণ, কিন্তু মনে হয় এর দরকার ছিল—'একদিকে কেম্ব্রিজের এম. এ. বিখ্যাত সুসভ্য ও শ্রদ্ধেয় ফাদার লিণ্ডন। অপর দিকে কোন্ এক জংলী ডিহির বুড়ো সোথা, দীনতম নগণ্য অর্ধোলঙ্গ ও বর্বরবেশী এক যাদুমন্ত্র। যেন দুই যুগের লড়াই—বিংশ শতক বনাম প্রাক্ ইতিহাস।' কিন্তু এখানেও

মনে রাখা দরকার, প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব এ নয়। মিশনারি স্কুলের খ্রীষ্টান ছাত্র ষ্টিফেন হেরোর বিরসাইট মুণ্ডা রুন্থ হেরোতে রূপান্তর ইতিহাসের ধারানুসরণেই তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতবর্ষের স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে বিরসা-অভ্যুত্থানের যোগ আছে। তবে বিরসা আন্দোলন সফল হয় নি। শুধু চিরকি মুরমু খ্রীষ্টান হয়ে মিশনে যোগ দিয়েছে তাই নয়, 'ষ্টিফেনও সেই পরাজয়ের দুঃখেই বনবাসে চলে গেল।' কিন্তু গল্পটি বর্ণিত হয়েছে বাঙালী মধ্যবিত্তের আত্মকথনের মধ্য দিয়ে, তার উচ্চাভিমান, নীচতা, সাময়িক উত্তেজনা, আর সব শেষে আত্মগ্লানি ("ফসিলে"র মুখার্জীর পরিণাম) : 'কাউকে মুখ ফুটে বলতে লজ্জা করবে, একটা ভুলের স্মৃতি কিছুক্ষণের জন্য কাঁটার মতো মনের মধ্যে বিঁধছিল। হয়তো আমরাই একেবারে নিরপেক্ষ থেকে চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধে ষ্টিফেনকে হারিয়ে দিয়েছি।'

কিন্তু সুবোধ ঘোষের ইতিহাসবোধের মধ্যে কোথাও একটা অস্পষ্টতা ছিল। অনেক সময় মনে হয় তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সমাজ-সত্যকে ঠিকই ধরেছে, আবার কখনো যেন তাঁর গল্প শ্লেষ বা ব্যঙ্গেই শেষ হয়ে যায়। তা না হলে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'-এর মতো গল্প তিনি লিখলেন কি করে? ইতিহাসের অধ্যাপক বিমল বসুকে নিয়ে ব্যঙ্গ করলে কোনো ক্ষতি ছিল না, কিন্তু বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদ বা চরিত্রহীনতাকে 'হিস্টরিক্যাল মেটিরিয়ালিজ্‌ম' নামে অভিহিত না করলেও চলতো। সুবোধ ঘোষ বস্তুবাদ বা জড়বাদে বিশ্বাস করেন না, তার পরিচয় প্রথম দিকের গল্পেই মেলে; পরের দিকে ক্রমশ আদর্শবাদ তথা অধ্যাত্মবাদ প্রবল হয়ে ওঠে, কিন্তু তার বীজও লুকিয়েছিল প্রথম দিকের গল্পে।

দুই

সমাজজিজ্ঞাসার সঙ্গে জীবনজিজ্ঞাসার সত্যই তো কোনো বিরোধ নেই। লেখক জীবনকে কত ভাবেই না দেখেন! সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ অনেকগুলি গল্পে আমরা পাব সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনজিজ্ঞাসা। যুদ্ধের সমকালেই লেখা "যাযাবর" একটি ভালো গল্প। বাহান্ন টাকা মাস মাইনের ওভারসিয়ার নরেন-বাবুর গল্প। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, কিন্তু ধনী বৃন্দাবনবাবুর ভোগসুখে তাতে বাধা ঘটে না। আর অসংখ্য সন্তান, প্রচণ্ড পরিশ্রম, বাড়িভাড়া না দিয়ে পালিয়ে বেড়ানো নরেনবাবু সস্তায় আহার্য খুঁজে বেড়ান, কোনো ক্ষোভ নেই দুঃখ নেই। জীবনযুদ্ধ কাকে বলে নরেনবাবু তা জানেন, বরং পৃথিবীজোড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান বড়ো কম। শুধু বাঁচবার তাগিদে সপরিবারে তাঁকে যাযাবর-বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। সমাজের দৃষ্টিতে এরা অপরাধী, কিন্তু লেখকের 'মনে পড়ছে, বেশ ভাবওয়ালা ভাষা দিয়ে পুরনো কালের ইতিহাস যে সব কথা লিখছেন নির্মলদা, তাঁর নতুন বইটাতে—নতুন তৃণভূমির স্বপ্ন দু'চোখে, শস্য-কণাপ্রলুব্ধ যাযাবর মানুষের দল দিকে দিকে ছুটে-হেঁটে চলে যাচ্ছে। পেছনের যত পরিচয় দুহাতে মুছে ফেলে, যত বন্ধ্যা মাটির ঢেলা অবহেলায় মাড়িয়ে ওরা একদিন চলে যায়। ওরা বাঁধা পড়ে না কোথাও।'

"শক খেরাপী" গল্পের বেসিল মুরকেও অপরাধী সাব্যস্ত করা সহজ। ইয়র্ক-শায়ারের নীলরক্ত ব্রিটন শুধু পিতার প্রত্যাশা পূর্ণ করে না তাই নয়, ওয়ার্ন্টার্স এণ্ড স্টোক্‌স্ এণ্ড লেন্‌স-এর দল যেমন তাকে মনে করে জিপ্‌সি, তেমনি বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ তাকে ভাবে রুচিহীন অধঃপতিত। শেষ পর্যন্ত বিড়িওয়ালা, মিস্ত্রি, সবজিওয়ালা আর মোটরবাসের খালাসীদের সঙ্গে তার ভাব হয়। কিন্তু তারাও যেন বেসিলকে ঠিক বুঝতে পারে না। হয়তো একমাত্র চম্পা তাকে বুঝতে পেরেছিল। বেসিল নিজেকে খুঁজছিল, এ একধরনের আত্মআবিষ্কারের চেষ্টা। তারপর চম্পার মৃত্যু, প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালা,—এরই মধ্য দিয়ে শক খেরাপী সম্পূর্ণ হয়েছে। আকস্মিকতা আছে সন্দেহ নেই, পরিণামটুকুও খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিন্তু তবু নানাভাবে সম্পর্কস্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টাই যেন তাকে সফল আত্মোপলব্ধিতে পৌঁছে দিল—'বেসিল বেশ বুঝল, তার ধমনী থেকে আজ নেমে গেছে একটা বিষের ভার। নতুন রকম লাগছে আজকের নিঃশ্বাস।'

আমরা যাদের বলি অপরাধপ্রবণ, কখনো অসামাজিক, তাদের প্রতি কি সুবোধ ঘোষের একটা বিশেষ টান ছিল? "জঙ্গলীর জ্বালা", "দুঃসহধর্মিণী", "কৌন্তেয়", "কুটিলপন্থ", "পন্থতিলক", "ঠগের ঘর"—এমন অসংখ্য গল্পে একটু অদ্ভুত ধরনের নরনারীর সাক্ষাৎ মেলে। অথচ গল্পগুলিকে নিছক 'রিয়ালিটির কারি-পাউডার' বলা যাবে না, বরং যেন কিছুটা আদর্শবাদের স্পর্শে কুৎসিতের মধ্যে সুন্দর, অসতের মধ্যে শুভবুদ্ধি আবিষ্কারের চেষ্টা দেখা যায়। সুবোধ ঘোষ আসলে রোমান্টিক, এবং সে রোমান্টিসিজ্‌ম কোনো বিশেষ পর্বের লক্ষণ নয় (শেষের দিকে অলংকৃত ভাষার আতিশয্য ও মাধবীভিলা-ধরনের ইচ্ছাপূরণের গল্পকে আলোচনার বাইরে রাখছি—সেখানে রোমান্টিসিজ্‌ম নয়, একজাতের সেন্টিমেন্টালিজ্‌মের প্রশ্রয় চোখে পড়বে)। প্রথম থেকেই তিনি অসামান্যের সন্ধানী। "অযান্ত্রিক" একালের "আদরিণী"।—জগদ্দল! বিমল আস্তে আস্তে

ডাকে। স্নেহে দ্রব হয়ে আসে তার কণ্ঠস্বর। তার সকল মমতা রক্ষাকবচের মতো জগদ্দলকে যেন এই সমবেত অভিশাপ আর নিত্য গঞ্জনা থেকে আড়াল করে রাখতে চায়।' ট্যাক্সিড্রাইভারের ট্যাক্সির প্রতি অপত্যস্নেহ এক অজানা জগতের সন্ধান দেয়। এখানেও গল্পের শেষে চমকটুকু বিশেষভাবে লক্ষণীয়: 'এরই মাঝে শুনতে পাচ্ছে বিমল—ঠং ঠং ঠকাং ঠকাং। ছিন্নভিন্ন ও নিহত জগদ্দলের জন্য কারা যেন কবর খুঁড়ছে। ঠং ঠং ঠকাং ঠকাং, যেন কতগুলি নিষ্ঠুর কোদাল আর শাবলের শব্দ।'

এখানে পরিচিত অভিজ্ঞতাজগতের সাক্ষ্যবিচার অবান্তর। একে কি বলব অপরিচয়ের রস? "সুন্দরম্" গল্পে সুকুমারকে প্রথমে মনে হয় চমৎকার ক্যারি-কেচার, ব্রহ্মচর্য পালনের পরিণামে 'মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই', এবং সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান! কিন্তু দেহধর্মের তাড়নায় ভিখারিনী তুলসীকে তার প্রয়োজন। তত্ত্ব প্রতিপাদনের দিক দিয়ে ঠিক আছে:—কৈলাশ ডাক্তার তুলসীর শব ময়নাতদন্তকালে চিন্তা করেন 'কুৎসিতা তুলসীর ঐ রূপের পরিচয় কে রাখে! তবুও মানুষের এ তিমিরদৃষ্টি হয়তো ঘুচে যাবে একদিন। আগামীকালের কোন প্রেমিক বুঝবে ঐ রূপের মর্যাদা। নতুন তাজমহল হয়তো গড়ে উঠবে সেদিন!' —একেই বলতে চেয়েছি সুবোধ ঘোষের রোমান্টিকতা। এর সঙ্গে গল্পের অন্তিম চমকপ্রদ মন্তব্য খাপ খায় না—'শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে।' তবু "সুন্দরম্" সুবোধ ঘোষের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প, কারণ আদর্শবাদী লেখকের সমাজ-চেতনার চূড়ান্ত নিদর্শন কৈলাশডাক্তার।

আর যাকে বলি আমরা নিছক প্রেমের গল্প, সেখানেও সুবোধ ঘোষ মানব-চরিত্রের আপাত স্ববিরোধকে ধরতে চান। কাহিনী বা চরিত্রের বাস্তবতা সেখানে বিচার্য নয়। ছোটগল্পের চমকটুই আসলে উপভোগ্য তবে প্রথম দিকের গল্পে প্রচ্ছন্ন কৌতুক ও পরিহাসের ভঙ্গি অন্তরের বেদনাকে হয়তো কিছু ঢেকে দিয়েছে, যেমন "গরল অমিয় ভেল" গল্পে মালা বিশ্বাসের জীবনের শূন্যতাবোধ ও স্বেচ্ছারচিত 'খড়ির আখরে এক স্তবক ঘনঘোর মিথ্যা শাদা ফুলদলের মতো ছিটিয়ে' দেওয়া! তবে ক্রমশ যেন ব্যর্থতার বদলে মিষ্ট মিলনের, তুচ্ছ মান-অভিমানের মধ্যবিত্ত জীবনগাথা প্রধান হয়ে ওঠে। 'আগ্রা আর লখনউ' স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ আনতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত সহজ সমাধানের পথ নেয়: 'দুজনে সেই সন্ধ্যাতে একসঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে আর হেসে হেসে গল্প করতে করতে তাজ রোড ধরে এগিয়ে যেতে থাকে।' কিংবা "কুসুমেষু" গল্পে নীহার আর

হেমা—দুই স্বতন্ত্র পরিবারের শিক্ষা ও সংস্কার যাদের মিলতে দেয় না—কিন্তু মুহূর্তের দুর্বলতা, না কি হৃদয়ধর্মের তাড়নায় : 'দুরন্ত আগ্রহের দুইবাহু আর উত্তাপে বিহ্বল একটা নিঃশ্বাসের টানে হঠাৎ বিব্রত হয়েও পরক্ষণেই বুঝতে পারে, আর বুঝতে পেরে ধন্য হয়ে যায় হেমার মন, সত্যিই তো, স্বামীর বুকেই বন্দী হয়ে গেছে হেমা।' এইভাবেই নীরব হয় 'কথামালা'—বিনীতা মল্লিকের অবরুদ্ধ ইচ্ছা চরিতার্থ হয় ধ্রুবজ্যোতির সাদর বরণে—'ঠিকই তো! কথা বলবে কেমন করে মেয়েটা? ওভাবে মুখ বন্ধ করে দিলে কোন মেয়েই কথা বলতে পারে না।'

কিন্তু এই ধারায় আর খুব বেশি এগোনো সম্ভব ছিল না। ফলে সুবোধ ঘোষের শেষের দিকে গল্প ক্রমশ প্রসাধনবিলাসী হয়ে ওঠে। "ফসিল" "গোত্রান্তর" যিনি লিখেছেন, তাঁর পরিণাম এত ভয়ংকর কেন? সুবোধ ঘোষ "তিলাঞ্জলি"র লেখক সে কথা ভুলি নি, কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্বাস তাঁর নিজের ব্যাপার। লেখক গান্ধীবাদী হতে পারেন, অধ্যাত্মবাদী হতে পারেন, কিন্তু সমাজবাস্তবতাকে বিস্মৃত হয়ে সাহিত্যসৃষ্টি করতে পারেন না। অথচ সুবোধ ঘোষ দেশকালকে বুঝতে চেয়েছিলেন, তা না হলে "পরশুরামের কুঠার" বা "ভাট তিলকরায়" লিখতে পারতেন না। কিন্তু কোথাও একটা বোঝার ভুল ছিল; ঠিক স্ববিরোধ নয়, এক ধরনের আচ্ছন্নতাবোধ। ফলে দশ-বারোটি ভালো গল্প লিখলেন, ছোট-গল্পের শিল্পরূপটি ভালো মতোই আয়ত্ত করলেন—কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। লেখক প্রত্যাশা জাগালেন, প্রত্যাশা পূরণ করতে পারলেন না। সুবোধ ঘোষের কয়েক খণ্ড 'গল্পসংগ্রহ' পড়ে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়।

এবার ফল্গু

লোকনাথ ভট্টাচার্য

উপক্রমণিকা

ওর মুখটা পোড়া। পিঠটা খুলে দেখাচ্ছে না, সেটাও দগ্ধ। ঢুকছে ঘরে। ওর বসার জায়গা ক'রে দাও।

নদী, সঞ্জীবনী, বও শিরায়। চম্পক-নিন্দিত আঙুলের মুঠোয় তুমিও সযত্নে লুকিয়ে রাখো দুঃখ, দিগন্তে আগুনের মতো, সূর্যাস্তের মেঘে-মেঘে ললকে শিখা। সে-বহ্নিরও ছোঁওয়া লাগুক ওর কপালে।

বক্ষের অন্ধকার পিঞ্জরে ও বহন করছে পিতৃপুরুষের পুরী, কত অশ্বখুরের শব্দ, ধ্বনিও-প্রতিধ্বনিও প্রাচীর। অজস্র চোখের আশীর্বাদ, অতীতের কত পাষাণ-প্লাবিত ঝর্না। কাঁধের বোঁচকায় ওর, এ-জন্মের অনন্ত অভিশাপও।

বসার পরে, যেন ঠাণ্ডা আমেজটা পায়, পিঠ পেতে দেয়। এত ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত, তবু হাঁটু মুড়ে ঠিক আসনটি, পথ চলতে-চলতেও, ওর ধ্যানে চিরকালই ছিল। চৌকাঠে পৌঁছেই, ও ফেলে দিচ্ছে অহংকার, ভিজে গামছার মতো।

গামছা? উল্টে কী কিংখাব! ছাখো-ছাখো মণি। মণি, না রাংতা? ঐ বেরিয়ে পড়ল শিম্নটি পর্যন্ত, সব আব্রু গেল।

এমন নিঃশেষে রিক্ত, তাই যোগ্য হয়তো, অবশেষে, রশ্মিতে বিদ্ধ হ'তে।

তবু, তবু-তবু, হে দেবী মোনীশ্বরী, রাত্রি রাণীসাহেবা, আগে-ভাগে দিয়ে ব'সো না কিছু—না চুম্বন, না অভ্যর্থনা-সূচক সম্বোধন। নিরীক্ষণ করো প্রথমে ওকে। সন্তুষ্ট?

তবে মহীয়সী, কামুকা নারী, তুমিই তুলে নাও হাল। পথ ভেঙে এসেছে এত দূর, এক অন্য যাত্রার স্বপ্নে। সে-যাত্রা তুমিই শুরু করাও।

আমরা যারা রয়েছি, বা নেই, যদিও ভক্তেরই দল—সকলেই অন্ধ। নিশ্চয় কিছুই দেখব না। তবু, তবু···

এবার ফল্গু।

বিবাহ-মঞ্জিল

যদি একই দর মুড়ি-মিছরির, তোমার কী দরকার? তুমি কেন ভাববে? ধূলা বিকায় রত্ন হ'য়ে, রত্ন হয় ধূলা, তুমি কেন ভাববে?

এ-দেহ মন্দির, দেবতা জেগে রয়—ঝড়ের হাওয়ায় হয় অণু। তুমি কেন ভাববে? আছে এই দরজা—আছে তো? খোলো একবার, আলতো ক'রেও—খুললেই কাঁচাসোনা রোদ, পথ মিশে গেছে আকাশে-আকাশে।

তুমি কেন ভাববে?

তুমি ভাববে না, এ-ঘরে হঠাৎ এই বিশ্ব-সমাগম, সূর্য-চন্দ্র-তারা হাঁটু মুড়ে বসেছে জল-ভর্তি কুঁজোর পাশে, কনুইয়ে ঠেকিয়ে কনুই—ভাববে না, কী খেতে দেবে এই রক্ষী-মহারক্ষীদের, আহূত-অনাহূত অতিথি-অভ্যাগতদের।

এত মুকুট, মণি-মুক্তা, বিচ্ছুরিত রশ্মি, ভাই ব'লে ডাকে এ-কোণার দিনরাত্রি-মথিত আড়ষ্ট-সমাহিত অন্ধকারকে। স্তব্ধতা ভাষা দেয় অসংখ্য গুঞ্জন ও উৎসবের ভেরীকে। লোক ছোটে এদিকে-ওদিকে, এত ব্যস্ততা, এত উৎসাহ, মধুমন্দ্র মঞ্জীর মদিরা নারীদের, বিবাহ-মঞ্জিলে।

তুমি কেন ভাববে?

উড়ে গেছে ছাদ, একখানি অনন্ত কোন্ শঙ্খচিল, পাখা মেলে বসল এসে দেয়ালের চৌহদ্দিতে। ডানার পল্লবে-পল্লবে সামিয়ানার রামধনু রঙ।

তুমি ভাববে না।

এই ফাঁকায়, সহসার শিরশির শীতের হাওয়ায়, ধুপধাপ পড়ছে বাড়ী কোথাও, সিঁড়ি-বারান্দা-অলিন্দ ভগ্নস্তূপ নালন্দা—যে-কাপড় শুকোচ্ছিল চত্বরে, টান-টান মেলে-দেওয়া তারে, উড্ডীন পতাকা তারা কোন্ নিষ্ঠুর জয়ের। হাসি-কান্না, ফিসফাস কথা, প্রিয়ার থুৎনি ধ'রে এক মুহূর্তের চাউনি—জড়ো হচ্ছে বস্তায়, ঐ ছাখো বস্তায়, একের পিঠে অন্যে আঁটসাঁট এলোমেলো একাকারে। নয় খয়ে-খয়ে, যে-যার জায়গায় উদ্বাস্ত—উন্মূলিত, উৎপাটিত। না-না, ভাববে না, তুমি ভাববে না। সীমান্তের সব রেখা, বন-বনানীর বেড়, মুছে যায় প্লাবনের থৈ-থৈ জলে।

এই হয়েছে তবে! এবং যা হয়েছে, এক দমকা নিশ্বাসে, তাতে স্বভাবতই তুমি বিস্ফারিত নেত্রে, ভাবছ এ কোথায় এলে, নাকি এখানেই ছিলে? এই সেই ঘর, আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসার কোণ?

আমরা পাড়াপড়শি, রাম-শ্যাম-যদু-মধু, রাত শেষের গর্জন শুনে হাজির, চোখে এখনো কিছু ঘুম—হাজির, শব্দের পথ ধ'রে, পরে যেখানে আর পথ নেই।

এ-বাড়ীটা চিনতাম, তোমাকে চিনতাম, বাড়ীর খুঁটিনাটি আসবাবপত্র চিনতাম। এখনো চিনি, এবং এখনো দেখছি, যদিও দৃষ্টিতে আর কিছু নেই—এক তুমি ছাড়া, আর সমুদ্র ছাড়া।

তবু সমুদ্র যেহেতু কখনো থামে না, কেবলি এগোয়, এই বুঝি গেল ভেসে আমাদেরও বাড়ীঘরদোর, যা দু'হাত দূরে বই নয়।

তাই, যেন খানিকটা নিজেদেরই আশ্বাস দিতে, এসেছি বলতে এই আলোড়নের প্রভাতে, তুমি কেন ভাববে?

শ্মশানে সন্ন্যাসিনী

হাত রেখেছি যখন, যেই রেখেছি, আর কী তুমি হবে, প্রিয়া ছাড়া, অনন্ত ছাড়া, নদীর মতো যাত্রা ছাড়া, গঙ্গাসাগর সঙ্গমে?

বলবে তুমি, আমি হব শূন্যতা, হব ব্যর্থতা, শুষ্ক পত্রের সমষ্টি শীতের অরণ্যভূমিতে? বেলা যায়, যায়, কঙ্কন-কিনিকিনি রিণিরিণি-নূপুরের ধ্বনিতে—শোনা যায়, শোনা যায় না। সমুদ্র আছড়ে-আছড়ে পড়ে কোন্ বেলাভূমিতে! যাওয়ার ছিল, হয়তো গিয়েছিলাম, হয়তো যাইনি—হয়তো এখনো যাব। শুরু না হ'তেই অন্ত, কথা মিশে যায় নীরবতায়, আলো অন্ধকারে।

এই কুয়াশায় ছায়াছবির মতো কারা আসে, হাওয়ায় পৎ-পৎ কাঁপে তাদের মুখ, এই দেখি, এই মিলিয়ে যায়। কখন চোখের একটু কোণ, কখন নাক, কখন ক্লান্তি তাদের পায়।

ভৈরবী রাগিণী বাজে শিরায়, শ্মশানে ব'সে থাকে সন্ন্যাসিনী।

ফেলে দাও, ফেলে দাও এ-জঞ্জাল, হে আকুল, আপ্লুত মন—হাট ক'রে খুলে দাও দরজা। ভাই-বোন দাঁড়িয়ে আছে চৌকাঠের পারেই, প্রিয়-পরিজন আগত কত দিকদিগন্ত হ'তে—আগ্রহের উল্কি-আঁকা চোয়ালে চিবুকে। দাঁড়িয়ে আছে সূর্য-চন্দ্র-তারা, এবং যেখানে যাওনি, সেই মানস সরোবরেও প্রস্ফুটিত কমল।

হাত রেখেছি, তুমি হবে না প্রিয়া, সাগরসঙ্গমের নদী?

আজ নিমন্ত্রণ সকলের, শুনতে যা পাওয়ার আছে, পাওয়া যায়নি, সেই সব নীরব সঙ্গীতের কলি। সেইসব দৈত্য-দানব-পিশাচ, যারা কৃষ্ণ-করাল রঙ মাখিয়ে চলে

দেয়ালে-দেয়ালে, যাদের হওয়ার ছিল দেবতা, যারা দেবতা হবে। সেইসব কথা, যা বাজতে না বাজতেই ভেঙে যায়, বাঁশি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ধু-ধু প্রান্তরে। কথা, যা গজমতি মালার মতো গ্রথিত হওয়ার ছিল, হবে।

কাঁসরঘণ্টা বাজল কি বাজল না আরতিতে, পূজা প্রস্তুতই ছিল, আছে। ভক্ত এক অনাথ শিশু, অপারগ নৈবেদ্যের আয়োজনে, মন্ত্রের উচ্চারণে। তবু কামনা মায়ের মতো আচ্ছাদন ক'রে আছে এ-শূন্যের রন্ধ্র-রন্ধ্র, আবহাওয়া ভরপুর স্বপ্নের উষ্ণ নিশ্বাসে। কে এল, কে গেল, কে রূপ পেল না পেল, কোন্ সৃষ্টির বা অনাসৃষ্টির কারখানা এই, সে-বিচার বিচারপতির হাতে।

আমি যা দিতে পারি, দিচ্ছি, তা সর্বস্ব সমর্পণের অঞ্জলি, অকৃতার্থ করপুটে।

সমুদ্র আছড়ায়, বেলা যায় কিনিকিনি-কঙ্কন রিণিরিণি-নূপুরের ধ্বনিতে।

হাত রেখেছি যে, তুমি কী ক'রে না হবে প্রিয়া?

প্রিয়া? সেও দাঁড়িয়ে আছে, চৌকাঠের বাইরেই, মুক্তিকামী সূর্য-চন্দ্র-তারাদের ভিড়ের অন্যতমা। যা শেষ হওয়ার নয়, তা কেমন হঠাৎ হচ্ছে শেষ, দেখছ তো, হে আকুল, আপ্লুত মন?

প্রচণ্ড বিদ্যুৎ সেদিন

বজ্রে যা বলেছিল, ধরা আছে এই দেয়ালে। দেখেছি যে, শুনেছি যে, জানি যে—ধরা আছে, ধরা আছে।

সে কী প্রচণ্ড বিদ্যুৎ সেদিন, বিদীর্ণ মেদিনী—অতীত-বর্তমান তোলপাড়। এই ক্ষুদ্র পরিসরে, আঁটসাট বেড়ার অবরোধে, হঠাৎ।

এ-ঘরে আমার পা কাঁপে তাই, প্রায়ই, একলা মুহূর্তে, ব'সে-ব'সেই, ভাবতে-ভাবতেই। মনে হয়, আবার যদি হঠাৎ, আবার যদি এখনই··· ! আমার কল্পনায় চিড়্-চিড়্ খেয়ে যায় আকাশ তখনই, অট্টালিকা ধূলিসাৎ হয়—শত সমুদ্র গর্জন তোলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

ছোটর থেকেও ছোট আমি, সাধারণ বলাটাও অত্যুক্তি—তাই যা শুনেছিলাম একদিন, কোন্ ভরসায় আমি সে-কথা এই সামান্য মুখে, বলতে যাই রাস্তার লোককে?

জানি না, আমি সবাইকে প্রাণপণে এড়াই—কেউ চোখে রেখেছে কি চোখ, নিজের চোখটা নামিয়ে নিই। কিন্তু এড়াই কী ক'রে সেই নিজেকেই, বিশেষত

একলা মুহূর্তে, এই ঘরে? এই সেই দেয়াল, হতভাগা, ধ'রে ব'সে আছে, জানি ধ'রে ব'সে আছে তাকে। এত খুশী, যেন গোঁফে তা দিচ্ছে—আমি বেশ দেখতে পাই, দেখতে না চেয়েও। ফাটে যদি, এই মুহূর্তে ফাটে, খিল-খিল হাসির হুংকারে! অমনি জড়োসড়ো হই, কুঁকড়ে যাই, থর থর পা কাঁপে আমার প্রায়ই, আমার পা দুটো বড্ড কাঁপে।

বন্ধু-বান্ধব যারা হুট ক'রে এসে পড়ে ঘরে, ন'মাসে-ছ'মাসে, বা ক্বচিৎ-কদাচিৎ কোনো মাননীয় অতিথিও, তাদের অঙ্গবস্ত্রে সুচারু নকসার পাড়, তখন ছুটে যে এগিয়ে যাব, বলব আসুন-আসুন—তা নয়, হাত-পা সেঁদোয় পেটের ভিতরে, মুখে রা'টিও কাড়তে পারি না।

মনে হয়, সময় বুঝে যদি এখনই হঠাৎ, আবার যদি এখনই··· !

ওরা ভাবে, লোকটা মুখচোরা, অশিক্ষিতের হদ্দ। যদি ভাবে, ঠিকই ভাবে। ছোটর থেকেও ছোট আমি।

ভণিতা হ'ল, এবার আজকের প্রসঙ্গ।

কোথাও কিছু নেই, না ব'লে না ক'য়ে সহসা তুমি এসে হাজির। ডাকিনি তোমাকে, পরিচয়ও নেই, শুধু চুপিচুপি তাকিয়েছি এক-আধবার যখন সামনে দিয়ে চ'লে গেছ, কাঁপিয়ে দৃষ্টিতে তরঙ্গ, পথকে ক'রে ছবি।

মূঢ়া নারী, পালাও পালাও, এ-ঘরে বজ্র খেলে, এ কোথায় এসেছ! উড়ে যাবে প্রেম ফুৎকারে, চূর্ণ ভস্মে পরিণত হ'তে পারি এখনই দুজন, হ'তে পারি অখণ্ড মহাকাশে একাকার, এবং শেল বিঁধিয়ে বুকে, অকল্পনীয় বিরাটের নির্ঘোষটা ফেটে পড়তে পারে—এখনই, এখনই!

বজ্রে যা বলেছিল··· কী বলেছিল?

পালাও নারী, পালাও পালাও—এই স্বগতোক্তি তোমার প্রতি। মুখে অবশ্য রা'টি কাড়ছি না।

মুখচোরা যে—ছোটর থেকেও ছোট, সাধারণ বললেও অত্যুক্তি।

পাখি উড়ে গেছে

চোখে দৃষ্টি কম যখন, নিবু-নিবু দীপ, খুলে যায় ভিতরের দরজা—এই কথা পাখি এসে বলে, ব'লে উড়ে যায়।

পৃথিবী প'ড়ে থাকে সূর্যাস্তে দগ্ধ, রঙবেরঙের জামায় বনবনান্ত নাটকের পাত্র-পাত্রী—ক্ষণিকের খেল্। অন্ধকার ঘনীভূত হ'য়ে আসে।

ঘরে, তুমি-আমি ব'সে—দিনের ফিসফাস স্তব্ধ হ'য়ে মরতে থাকে, থমকে-থমকে। পাল নামায় নৌকা, বৈতরণীর যাত্রী ভাঁটার স্রোতে, যেটা দেখা যায় না, এ-ঘর থেকে না। যা দেখা যায়, যাচ্ছিল কিছুক্ষণ আগেও, সেইসব দেয়ালে-টাঙানো ছবির সারি-সারি মুখ বা হাতপাখা, পাড়ি দেয় অবলুপ্তির রাজ্যে, তাড়িত দু'র হ'তে দূরান্তে।

পাখি বলল ব'লেই নয়, এমনিতেও মনে হয়, কোন্ পুরীর সিংহদ্বার খোলে কোথাও—শুনেছি, সেখানে, পথ চিনে এগোতে হয় আঁধারেই, হাতড়ালে রত্ন ছোঁওয়া যায়।

এ কি তোমারই নিশ্বাস পড়ে, না কোন্ দমকা হাওয়ায় উষ্ণ ভাপ? জানি না তুমি-আমি চলেছি কিনা একই পথে, এক পুরীতে। হাত ছিল হাতে, এখনো রয়েছে ব'লেই জানি, তবু পথে ধ'রে আছি কি একে-অন্যকে?

আমি তো সমুদ্র শুনি, দূরে কোথাও, অস্পষ্ট কোন্ গতজন্ম বা আগামী জন্মের মতো—আর তুমি?

ছেদ নেমেছে কথায়, প্রশ্নটা পাড়ি কী ক'রে, তুমিই বা উত্তর কী ক'রে দাও—যদি অবশ্য থাকোই। হয়তো তোমারও আছে প্রশ্ন, হেন জাতেরই, যা আমি শুনছি না, উত্তর দিচ্ছি না।

কে জানে একি বোঝাবুঝিরই এক শিশুসুলভ ভুল কিনা, অর্বাচীন প্রসাদ কুহেলিকায়, তবু আশা-অভীপ্সার বেগ ধূলা ওড়ায়, কাঁপায় জানি না কী চাওয়ায়, ছোটায় কোন্ পাওয়ায়।

মুছে দিয়ে মর্মর সৌধ, কিছুক্ষণ আগের জ্বলন্ত কণিকা এ কোথায় ক্রমশই নিয়ে আসছে আমাদের, নিজে উধাও হ'য়ে তেপান্তরের পারে। তুমি কিনা জানি না, আমি তো কুড়োচ্ছিই কিছু বলা কথা, কিছু শোনা গানের কলি, কিছু চূর্ণ কিছু পূর্ণতা অতীতের। কিছু ধূম্র কিছু তাম্র কিছু মর্ম কিছু মর্মহীনতা, দিনান্তের।

এদিকে জীবন প'ড়ে রয় পথে-পথে বিছায়িত, শায়িতা নিদ্রালসা নারী মুক্তকুন্তলা, স্বপ্নকামুকা। দিনে-রাত্রে ব্যাপ্ত পথ আলোয়-অন্ধকারে, অবিভাজ্য সময়ে। কথা চলছে যেখানে, শেষ হয়েছে যেখানে, আবার শুরু হবে যেখানে—বৃত্ত ঘুরবে, ঘুরছে।

তুমি-আমি হয়তো অনেক দূরে-দূরে ইতিমধ্যেই, হয়তো কখনো আর মিলব না—হয়তো মিলেই আছি। হয়তো ব'সেও নই, হয়তো চলছিই না, সব প্রশ্ন পাড়ার, সব উত্তর চাওয়ার এই মত্ত মদির অবকাশে,

যখন তার কথা ব'লে, পাখি উড়ে গেছে।

দেখছি দেখছি দেখছি, দরজা খুলছে, অচেনা নামের রাজ্য উঁকিঝুঁকি মারে। যত অঙ্গীকার ছিল, সমর্পণ ক'রে দিই তোমার পায়, নগ্ন যাত্রায়,

যে-পায়ের প্রতিকৃতি শাশ্বতী প্রতিমা এই বুকে। অন্ধকার, অন্ধকার।

ওঠ্‌বোস্

ওঠ্‌বোস্। হাত এদিকে, হাত ওদিকে। মাথা সামনে, মাথা পিছনে—হেঁই-হেঁই-হুইহুই নিশ্বাস। আর ঘাম, কী ঘাম লোকটার! হবে না? হবেই তো।

এ-প্রান্তরে ধূ-ধূ বালু, মধ্যিখানে ওর কুটীরটা আছে। কী ক'রে আছে? বেলা যায়, শিশু বড় হয়, মাংসপেশী ক্রমশই জোরালো—ঊর্ধ্বের অগ্নিপিণ্ড ভীষণতর হয়।

আমরা যারা দূরের গ্রামের, মাথায় রুমাল দিয়ে কোনোরকমে সামলাচ্ছি সূর্য, এসে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়েছি হতবাক এখানে-ওখানে, ওর থেকে বেশ তফাতে—ভাবি, কেন আমাদের ডাকা হয়, বাড়ী-বাড়ী ঘুরে নিমন্ত্রণলিপি কেন ও ছেড়ে আসে গত সন্ধ্যায়?

এসেছি, কারণ চিঠিতে প্রতিশ্রুতি ছিল সুর শোনানো হবে, খরায় বর্ষা নামবে, পঙ্গুকে দেওয়া হবে পা। তাই তো কেউ-কেউ এসেছে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে, উঁচু-নিচু পথ ভেঙে, লাঠিতে ভর দিয়ে।

পথে চলার সময় দৃষ্টি তাদের ছিল প্রখর, প্রত্যাশায়, প্রতীক্ষায়। যদিও সন্দেহ তখনই উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে, ও মা, এ তো ক্রমশই বনের শেষ, তবে কি মরুরই ঠিকানা ছিল চিঠিটাতে?

এবং বন শেষ হল যেই, পারহীন সাগরের মতো মরুই জাগল চোখে। তবু তখনো ওরা ভাবে, না-না-না, হ'তেই পারে না, এ-মরু পথ বই নয়, গন্তব্যে থাকবেই সরোবর। সুর শোনাবে যে, ঘন কৃষ্ণ মেঘ চিরে বর্ষা নামবে যে!

জোয়ান বা বুড়ো, বা নাতি নিয়ে কাঁধে-পিঠে পিতামহীর দল, এ-ভিড়ের আমরা সবাই তাই বেশ একটু বিমূঢ়—কেউ-কেউ হয়তো ভাবছেও, ফিরে যাবে কিনা। এতবড় আস্পর্ধা লোকটার, এমন মশকরা? তাও হয়তো ভাবছে কেউ।

ওর কিন্তু ভ্রূক্ষেপও নেই, চালিয়েই চলেছে একবার এদিকে এ-হাত, একবার ওদিকে ও-হাত।

তবে কি এটা বোধহয় যজ্ঞের প্রথম পর্বই, কিছু প্রাত্যহিক আসন ভদ্রলোকের—

নিত্যকর্ম গোছের ? এর পরেই শুরু হবে যথার্থ মন্ত্রোচ্চারণ, বা কিছু ভীষণ, বা কিছু এদিক ওদিক, কিছু ওলট-পালট, কিছু চমক, কিছু ঝমক, কিছু নতুন সৃষ্টি একেবারে ? হবে, হবে, হ'তেই হবে, এত বিশ্বাস নিয়ে আমরা যে এসেছি এতজনে —বলি আমরা নিজেদের, নীরবে, যখন বেলা গড়িয়ে চলে, আরো তপ্ত হয় পায়ের চেটোতে মাটি।

কী হবে, কী হবে —এবার কী হবে ?

ওর কিন্তু সমানেই এই এদিকে এ-হাত, ঐ ওদিকে ও-হাত। আমরা যে এসেছি, দাঁড়িয়ে রয়েছি, তাখেও নি। যখন আসছিলাম, স্তব্ধ প্রকৃতিতে নড়ছিল কিছু, তখনও আড়চোখে, হেলায় কি অবহেলায়, দেখেছিল কিনা জানি না।

ও কি শুনছে কোনো সমুদ্র ভিতরে ? বা কোনো ঝর্নার শব্দ ?

আমরাই বা দাঁড়িয়ে থাকি আর কতক্ষণ ?

যদি শেষে ফিরতেও হয়, হতাশায়, ব্যর্থ মনোরথে, কোন্ শক্তিতে ভাঙব আবার এতদূর পথ, কোন্ মুখে পৌঁছোব পরিচিত ধূলিধূসর গ্রামে ?

না-না, ফিরব না, কিছুতেই না, কেউ-কেউ সে-কথাও বলছি হয়তো।

মনগড়া কথা

ধুত্তোর, ব'লে যেই সে বেরিয়ে গেল দরজা খুলে, পিছনে ফেলে রেখে শুকনো পাতার পাহাড়, জানল না তারই তছনছ সংসার ধাওয়া করল তাকে—আর তছনছ নয়, জোড়া লেগে গেছে প্রান্তে-প্রান্তে, পরিপূর্ণ পৃথিবীর সুষমা তার অঙ্গে-অঙ্গে।

সে জানল না, হয়তো জানতে চাইলও না। এখন ঐ চলেছে, উদ্ধত, নির্বিকার। ওলট-পালট যা কিছু হয়েছিল ঘরে, সব তো তারই সৃষ্টি, বা অনাসৃষ্টি—যা ভেঙেছে, সে-ই ভেঙেছে, গড়তে চাওয়ার অহংকারে। কুটীর ছিল যদি পরিপাটি, সে চাইল সৌধ—যদি মাটীর কলস কোণায়, চাইল স্বর্ণসিন্দুক। এখানে এ-রঙ নয়, ওখানে ও-আলো নয়, চেঁচিয়ে বলেছিল।

বলেছিল সে, এ-অন্ধকার নয়, চায় স্বপ্নের গোধূলি।

যখন কিছুই বদলালো না, সব গ্যাঁট হ'য়ে ব'সে রইল যে-যার জায়গায়, নিজের-নিজের রূপে, ধূলা তো ধূলাই, মুখ তো মুখ, তখন কী আক্রোশ তার, কী অভিমানের সমুদ্র গর্জালো ভিতরে। শব্দ তুলল ঝন-ঝন মেঝেয়-দেয়ালে, রেকাবি টুকরো-টুকরো ক'রে করল খান-খান।

ব'য়ে গেল, আমার ব'য়েই গেল, ব'লে বেরিয়ে গেল সে।

বাহির পৃথিবীর সংসার তখন আপন ছন্দে চলমান, সন্ধ্যা নামে-নামে। সেখানেও ভাঙছে-গড়ছে, ক্যাঁচকোঁচ শব্দ গরুর গাড়ীর চাকায়—তবু ওর মতো অভিমানের ফলে নয়, কোনো দাম্ভিকের আক্রোশে নয়। যা হচ্ছে, হচ্ছে স্বভাবে, প্রকৃতির স্বনির্বাচিত রীতিতে।

রৌদ্রদগ্ধ দিন। তাই অপরাহ্নের এই অন্তে যখন মুমূর্ষু অশথ শোনে শিরায় সঞ্জীবনী, আমরাও গুটি গুটি এসে হাজির পথে, আমাদের এ-বাড়ী ও-বাড়ী হ'তে, কিছু প্রাত্যহিক বেচা-কেনায়, এর-ওর সঙ্গে এক-আধ কথায় সামাজিক আলাপ-চারিতায়।

তখনই হঠাৎ চোখে পড়ল দৃশ্যটা—ও চলেছে বেপরোয়া, হন হন পায়ে, হাতে হাত মুড়ে পিঠে, দৃষ্টি সটাং সামনে, তবু যেন কিছুই দেখছে না। এবং সেই তালে তাল রেখে, রথারূঢ় মূর্তির পিছনে যেমন গদগদ ভক্তের দল, ওর অনুসরণ করছে গোটা একটি ঘরের সাজ-সরঞ্জাম, হাতপাখা-বিছানা-চাদর-দেয়ালের ছবি, সব ধুলোঝাড়া, ঝকঝকে তকতকে, ভাঙাচোরা কোথাও নয়, ও তারই সঙ্গে ঘন কৃষ্ণ মেঘ একখানি এখানে, বা সূর্যাস্তের এক কণা বিভাসিত আকাশ ওখানে। রয়েছে সৌধটিও, স্বর্ণসিন্দুকটিও।

কার এইসব জিনিসপত্র, কার স্বপ্ন, কার সাধ, বা ও কী করেছে না-করেছে ঘরে, কী চেয়েছিল না-চেয়েছিল, বা কেন এরা এমন ধাওয়া করছে ওর, সে-সবের আমরা কিছুই জানি না, কারণ হেন স্পর্ধা কার যে ওকে যাবে জিজ্ঞেস করতে ?

তাই যা বললাম, সেটা পথচারী দর্শকদেরই মনগড়া কথা, দারুণ গ্রীষ্মের এক দিনান্তে—ভাবছি, হয়তো এ রকমেরই কিছু হ'য়ে থাকতে পারে।

জুয়াড়ী

জুয়া খেলে সূর্য-চন্দ্র নিয়ে, ভাবে মহাকাশ তো তার নিশ্বাসেরই বস্তু—খেলে সর্বস্ব পণ ক'রে, ঘরের খুঁটিনাটি, নিজের সুখ-দুঃখ, প্রিয়ার সঙ্গ।

খেলায় সে কেবলই হারে, সূর্য-চন্দ্র দিব্যি ঘোরে কক্ষপথে—আর সামান্য যে-সব ধন নিছকই আপনার, তারা করতলগত হয় প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়ের।

এতবার হারানো হয়েছে এই সব যে তাদের দিকে তাকাতেও তার ভয়—প্রিয়াকে সে বারবার পাঠিয়েছে অন্যের শয্যায়। সহস্রবারের এই অনাথ, নিঃস্বতা নিয়েই

খেলে, তবু খেলে। এত ধন-আয়োজন এই বিশ্বের, যা তাকে ঘিরে রেখেছে, পিষে মারছে, যাকে সে ভেবেছিল পৈতৃক সম্পত্তি, তা হাত থেকে পিছলে-পিছলে চ'লে গিয়ে এখন ঐ সূর্য-চন্দ্র-তারারই মতো, দূরের যাত্রী।

কাছেই আছে, ঘিরেই রয়েছে, তবু নেই। নেই ধরা-ছোঁওয়ায়, চাওয়া-পাওয়ায়—হা-হা হাসি ছুটে বেড়ায় অবোধ্য শিশুর মতো, দিগন্তে-দিগন্তে।

টিটকিরি? করুণা?

তবু খেলে সে, খেলেই চলে।

বিপক্ষী তার মহানুভব ব্যক্তি নিশ্চয়, তাই তাকে ফিরিয়ে দিয়েই চলে সূর্য-চন্দ্র-তারা, লজ্জায়-অপমানে কুঁকড়ে যাওয়া প্রিয়া, মধ্যাহ্নের সঙ্গী হাতপাখা, স্মৃতির শৈশব, বা স্বপ্নের রাত্রি। বলে, আবার খেলবে?—তো বেশ, খেলো।

অমনি উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি সর্বহারার, বার বার পরাজিতের, সমস্ত শক্তি জড়ো করা বাহুর পেশীতে। থামে সকল শব্দ, ঘর-ভর্তি দর্শক নিশ্বাসও ফেলে না, আলোতে জলতে থাকে ক্ষণ, হৃদ্‌পিণ্ড বাজে দপদপ দপদপ। কণামাত্র ধূলাটিও তার কচ্ছপের আবরণ খুলে হাত-পা বার ক'রে বসে, সর্বসমক্ষে, একাগ্র নিরীক্ষণে।

ফলাফল মুহূর্তে ঘোষিত। আবার পরাজয়। অদৃশ্যে হাসির হুংকার, মেঘ গর্জায়, ফেটে পড়ে বজ্র সারা আকাশ চিরে।

প্রাঙ্গণে আছে কলাগাছ, মালী জল দেয় ছুঁই-বেল-চাঁপার গোড়ায়—অদূরেই কুটীরে মায়েরও স্নিগ্ধ চাউনি। দিন-রাত্রি-সন্ধ্যা গৃহপালিত পশু, ডাক ছাড়ে, আসে-যায় পরিচিতির সীমানায়। গরুর খুরে ধুলার রেখা উঠতে-উঠতে মিলিয়ে যায় গোধূলির গ্রামে।

সেই সহজকে বিদায় দিয়ে, সর্বনাশ এ কী খেলার জোর চলছে এখানে? এই ঘর, জায়গা এত কম, তবু ভিড় করেছি সবাই, মাথায় ঠেকিয়ে মাথা আবালবৃদ্ধবনিতা। বিপক্ষীটিকে কেউই জানি না, কে জানে এসেছে কোন্ জনপদ হ'তে, তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। কে বলবে, কত বড় শক্তি তার, সে মালিক কোন্ ব্রহ্মাণ্ডের। কিন্তু হারছে যে, যতই অহংকারী হোক, অসমর্থ হোক, সে আমাদেরই জ্ঞাতি ভাই, বড়ো হয়েছি একসঙ্গে। বলতে হবে কি, আমাদের সকল সহানুভূতি ওরই প্রতি?

মনে-মনে আওড়াচ্ছি, ও জিতুক, জিতুক, একটি বার।

আওড়াচ্ছি, হে মহানুভব ব্যক্তি, তুমি আরো মহানুভব হও—ইচ্ছে ক'রে হেরে গিয়ে, অন্তত একটি বার।

ফুলের বাগানে হরিণ

তাকে আমি সরাসরি দেখেছি—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, বলবই, এ-কথা আমি বলবই, যখন অন্ধকারই ঘনীভূত হওয়ার আছে আকাশে, মাথা নিচু ক'রে পরাজিতের ভিড় জমা হওয়ার আছে অঙ্গনে।

বলবই, তা ওরা মুখে দেয় দিক থুথু, ভাবে ভাবুক অহংকারী। ওরা, যারা জড়ো হয় গ্রাম উজাড় ক'রে, কাতারে-কাতারে। ওরা, যাদের সিন্দুক ভরা শূন্য বাষ্পে। মনে পড়ে, পথে বেরোই একই সঙ্গে, পাথেয় ছিল না—আশা ছিল, অভীপ্সা ছিল, রাত্রির বিদ্যুৎ ছিল বুকে। দূরে পাখি ডেকে ওঠে, যেন কোন্ ওপার হ'তে, মনে হয় শুনি। একে অন্যের দিকে তাকাই, চোখে জ্ব'লে ওঠে অন্যের চোখের মণি, সাগরের ভিতর হ'তে দীপের উদ্ভবের মতো।

হাওয়া বয় শন-শন, অফুরন্ত আবেগে। পা চলে বেপরোয়া, নির্ভীক প্রত্যয়ে। পেরিয়ে যাই ঘুমন্ত পুরী, জনমানব নেই অলিন্দে। যত পেরোই, পথ যেন দীর্ঘতর হয়।

পরেই হঠাৎ কুহেলিকার ঝড়—হারিয়ে হাত হাত হ'তে, কে কোথায় পড়লাম ছিটকে। আলেয়ার আলোর মতো, এই ঝকমক করে শ্লেষের অসি, এই জ্ব'লে ওঠে অন্ধ-করা সন্দেহ। কে আমায় নাম ধ'রে ডাকে, যেন ডাকে, ডাক ভেসে যায় প্রান্তরে-প্রান্তরে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর বাঁশি।

মুখ বাঁচিয়ে ঝড়ের আক্রোশ হ'তে, আমি ঘাড় ফিরিয়ে থাকি—তবু এগোই। আর ভাবার চেষ্টা করি, যা-কিছু মধুর পেয়েছি এ-জীবনে, যে-কথা কখনো ব'লে বা শুনে দেহে বয়েছে নদী। অলৌকিক যে-চাওয়া চেয়ে এসেছি, তার রঙ ও আলো।

হুঁশ ছিল না, তবু বেঁচে নিশ্চয় ছিলাম সেই পরীক্ষায়। কখন দেখি, পথে-পথের পরিক্রমায় ফিরে এসেছি নিজেরি ঘরের সামনে, একলা। আশা নেই, অভীপ্সা নেই, খেদ নেই—ক্লান্তির যেন নেই আর। স্বপ্ন তো নেই-ই, স্মৃতি হয়তো কিছুটা আছে। কথা বলব, কোন্ কথা? বর্ণনা, কার?

পরে, কখন তাকে দেখলাম। কেমন দেখতে সে, সে-স্মরণ হরিণ হ'য়ে ঘুর-ঘুর করে নাম-না-জানা ফুলের বাগানে।

আরো পরে, ওদেরও ফিরতে দেখা, একটি একটি ক'রে, সকাল গড়িয়ে দুপুরে, দুপুর হ'তে বিকালে। কোন্ সিংহে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে শক্তি ওদের জানু হ'তে।

আমি বসেছি আসনে, কাল রাতের ঝড়ের দাপটের আমারই আঙিনায়। যখন সময় হবে, একটি কথায় বলব সেই সাক্ষাৎকারের ঘটনা।

সে-কথা এখনো খুঁজে পাইনি। যদি নাও পাই, দুঃখ থাকবে না।

না, অহংকার নেই, এতটুকু নেই, ওরা যা ভাবে ভাবুক। এমন-কি বিনয়ও নেই—আসলে কোনো ভাবই নেই আর। কথায় অরুচি এই শুকিয়ে-আসা জিভে। আমি যে দেখেছি, দেখেছি—দেখেছি তাকে।

ধূপের ধোঁওয়া

এ-মুহূর্তে কিছু উল্টোপাল্টা ঘটনা ঘটছে। কিছু বড়-বড়, কিছু ছোট-ছোট। কিছু ধ্বংসের দোর্দণ্ড প্রতাপে শেষ, কিছু সৃষ্টির নদীজল-স্পর্শে শুরু। কিছু-বা আবার চলছিল যেমন, তেমনই চলছে, শুধু নিসর্গের একটু অদলবদল।

শান্ত স্তিমিত হাসি, জীবনে প্রথমা, এলে ঘরে—পেতে দিই আসন। কেউ বা রক্তাক্ত নয়ন, দণ্ডধারী ভীষণানন—সে কেড়ে নেয় নিজেরই আসন।

ঘরে যেমন, তেমনই বাইরের সংসারে, লিপ্ত রয়েছি এই-অনুকূল এই-উজান স্রোতে—বহন করি স্মৃতি শৈশবের, কৈশোরের, প্রিয়ার প্রথম চুম্বনের। ঝরাপাতা কথা শুকনো শীতের অরণ্যে দূরে-দূরে ওড়ে।

ভাবময় এমনই জগৎ এই ক্ষণের, এই ঘরের—তুমি-আমি ব'সে সামনাসামনি, চিরাচরিত প্রথায়। নৈবেদ্যের থালি আমাদের ঘিরে রয়েছে দ্বীপের মতো, ধূপের ধোঁওয়ায় মশগুল হয় স্তূপীকৃত শূন্যতা, থরে-থরে সঞ্চিত এই সামান্য পরিসরে।

পাতা উল্টে কে দেবে নতুন প্রভাতে, কে বাঁশি বাজিয়ে তুলবে মধ্যাহ্নের খর খর প্রান্তর চমকে?

তুমি একটা, আমি আরেকটা—আবার তুমি-আমি দুজনে কিছু-একটা। সম্পদের সম্ভার, দুঃখের অনন্ত রাত্রি এইসব ঘিরে। যেন বলা যায়, হেন কথা নেই—আবার বলা যায় না, হেন শব্দও নেই। এমন প্রেম নেই যা পা দিয়ে দলানো যায় না।

এইটেই আসলে রূপ এই থমথমে নীরবতার, ধূপের গন্ধাকুল ক্ষণের। তোমার হাতটি আলতো ক'রে কোলে ফেলা—আমি যেন দেখেছি না, হেন দৃষ্টি। সমুদ্র আছড়ে পড়ে, কে শুনছে কোথায়?

এত অর্থ, এত অর্থহীনতা—তবু এত সম্পূর্ণ এই ক্ষণ চোখে-চোখে চেয়ে থাকা, মুখোমুখি ব'সে থাকা! নিটোল মুক্তা এক কণা। কী কষ্ট, কী কষ্ট জীবনের!

ঘরে ঢোকার আগে, আজ আমরা একে-অন্যকে বলি, সমাপ্তির একটি সুর টানব। তাতে থাকবে প্রার্থনার দ্যোতনা, শিশুর মুখের স্বপ্ন—বাজবে মন্দিরের সান্ধ্য ধ্বনি, আরতির কাঁসর-ঘণ্টা।

এদিকে যা বইছে, তা এলোমেলো হাওয়া—ঘরে, ও ঘরের বাইরে। যেন ব'সে থেকেই, সমাহিত ভাবেই, ছুটছি মরিয়া হ'য়ে, তোমার থেকে, আমার থেকে—আমরা দুজনে দুজনের থেকে। চুল ওড়ে অবিন্যস্ত, নিশ্বাস পড়ে ধক ধক।

নাম দেবে? সুর দেবে? দাঁড়ি টানবে? কোথায় আছ তুমি! কোথায় আমি বা আমরা দুজনে!

ঘ্যাখো-ঘ্যাখো, প্রেয়সী আমার, ধূপের ধোঁওয়ায় শিল্প—এই ঘর, পরিপাটী, তকতকে।

বন্যা ব'য়ে যায় রাস্তায়, সিঁড়ির তলাতেই, আমাদের চলার পথে—যে-পথে চলছি, ব'সে-ব'সেই।

কী কষ্ট, কী কষ্ট জীবনের!

ভাষাচিন্তা—সূত্র, রবীন্দ্রনাথ

পিনাকী ভাদুড়ী

শান্তিনিকেতন

"বিনয়সম্ভাষণ পূর্বক নিবেদন,

এতদিন পরে বাঙলাভাষার অভিধান পাওয়া গেল। পরিশিষ্টে বাঙলার যে সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ দিয়েছেন তাও অপূর্ব হয়েছে। সংস্কৃত নিয়মে লিখি সত্য, কিন্তু বলি শোত্তো। মন শব্দ যে কেবল বিসর্গ বিসর্জন করেছে তা নয় তার ধ্বনিরূপ বদ্‌লে সে হয়েছে মোন। এই যুক্তি অনুসারে বাংলা বানানকে আগাগোড়া ধ্বনি অনুযায়ী করবো এমন সাহস আমার নেই—যদি বাংলায় কেমাল পাশার পদ পেতুম তাহলে হয়তো এই কীর্তি করতুম··· যে পণ্ডিত-মূর্খরা গভর্ণমেণ্ট বানান প্রচার করতে লজ্জা পাননি তাঁদের প্রেতাত্মার দল আজো বাংলার বানানকে শাসন করছেন।···

কান হল সজীব বানান আর কাণ হল প্রেতের বানান, একথা মানবেন তো? বানান সম্বন্ধে আমিও অপরাধ করি অতএব আমার নজীর কোনও হিসেবে প্রামাণ্য নয়।

ইতি ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩১

আপনার গুণগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

'চলন্তিকা' প্রকাশিত হবার পরে কবি রাজশেখর বসুকে এই চিঠি লিখেছিলেন। বাংলা ভাষার বানান নিয়ে, ধ্বনিরূপ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার পরিচয় আছে এই চিঠিতে। শুধু এই চিঠিই নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রুফ দেখার একটি উদাহরণও এখানে উল্লেখ করা চলে। 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে 'কান' বানানটা ছাপা হয়েছিল 'কাণ'—রবীন্দ্রনাথ বানানটি শুধু ঠিক করে দেননি, আলাদা করে এই বাক্যটি লিখে দিয়েছিলেন—কম্পোজিটরের প্রতি নিবেদন এই যে, 'কান' শব্দের বানান 'কাণ' নয়, এবং 'সোনা' শব্দের বানান 'সোণা' নয়।

শব্দের ধ্বনিরূপ নিয়েও রবীন্দ্রনাথ নানা চিন্তা করতেন। তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের 'বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধটি এ বিষয়ে স্মরণযোগ্য। ইংরেজী উচ্চারণের অনিয়ম দেখে বাংলা উচ্চারণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে কবি আবিষ্কার করেছিলেন যে বাংলাতেও উচ্চারণের বিধির মধ্যে গোলযোগ আছে। সেই ভাবনা থেকেই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল। রাজশেখর বসুকে লেখা চিঠির মধ্যে যে 'গভর্ণমেণ্ট' বানানের কথা কবি বলেছিলেন, এই প্রবন্ধেও তার উল্লেখ করা আছে।

কবি লিখেছিলেন, 'এক এক জায়গায় অক্ষর আছে, অথচ তাহার উচ্চারণ নাই।··· মাস্টার মহাশয় psalin শব্দের বানান জিজ্ঞাসা করিলে কিরূপ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তাহা আজও কি ভুলিতে পারিয়াছি।··· বাংলায় এ উপদ্রব নাই। কেবল একটি মাত্র শব্দের মধ্যে একটা দুষ্ট অক্ষর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশ করিয়াছে··· শিশুদিগকে ভয় দেখাইতেছে, সেটা আর কেহ নয়—গবর্ণমেণ্ট শব্দের মূর্ধন্য ণ। ওটা বিদেশের আমদানি নতুন আসিয়াছে, বেলা থাকিতে ওটা বিদায় করা ভালো।'

উচ্চারণটা 'গভর্মেণ্ট', কিন্তু বানানে একটা অতিরিক্ত 'ণ', এই ইংরেজী অনুকরণটা কবির একেবারে পছন্দ হয়নি, সেজন্য চিঠিতে 'পণ্ডিতমূর্খ' শব্দের ব্যবহার থেকে তাঁর উষ্মাটি বুঝতে পারা যায়।

বাংলা ভাষার বানানে ধ্বনি বজায় রাখার ইচ্ছা ছিল কবির, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে তিনি পরবর্তীকালে সেটি করাতে চেয়েছিলেন। ১৩৩৪ সালের ৯ই অগ্রহায়ণ কবি সুনীতিকুমারকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,

> বিচিত্রা সম্পাদক তোমার নির্দেশ অনুসারে অক্ষর ঢালাই করতে রাজী আছেন এবং তুমি সে বিষয়ে ব্যাখ্যা করে যদি কিছু লেখ তাঁরা সেটাকে প্রকাশ করতে চান—এ সম্বন্ধে তোমার মতই সবচেয়ে প্রামাণ্য এই কারণে বাংলা বর্ণমালার নূতন অক্ষর যোজন তোমার মতো ধ্বনিতত্ত্ববিশারদের কাছেই প্রত্যাশা করি।

শেষ পর্যন্ত এটির কি হল জানা গেল না, কিন্তু এটা পরিষ্কার যে কবি ধ্বনি-নির্দেশক অক্ষর ঢালাইয়ের সুপারিশ করেছিলেন এবং বিষয়টি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাখ্যা করা যাতে হয়, তারও প্রয়াস হিসেবে সুনীতিকুমারকে লিখতে বলেছিলেন এবং তার প্রকাশের ব্যবস্থাও হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমারকে বলেছিলেন 'ভাষাচার্য'—সুনীতিকুমারও তাঁর *Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থের ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিকতা স্বীকার

করেছিলেন, The first Bengalee with a scientific insight to attack the problems of the language was Rabindranath Tagore...

কবি সুনীতিকুমারের লেখা ব্যাকরণ পড়ে আনন্দিত হয়ে একটি মতামত পাঠিয়েছিলেন। সেটি এই :

Registrar, Calcutta University

We have been waiting long for a Comprehensive Grammer of Bengali language. Our expectation has been amply fulfilled by the appearence of Bhasa Prakash Bangla Vyakaran by Dr. Suniti kumar Chatterji for which I offer him grateful blessings.

24. 10. 39. Rabindranath Tagore

সংস্কৃতের গণ্ডী ছাড়িয়ে বাংলার নিজস্ব ব্যাকরণ তৈরী হোক, রবীন্দ্রনাথের এই ইচ্ছা এই বইতে খুশী হয়েছিল।

আর একবার রাজশেখর বসুর প্রসঙ্গে আসা যাক। 'চলন্তিকা'র ২য় সংস্করণ পেয়ে কবি তাঁকে লিখলেন :

কল্যাণীয়েষু

তোমার নতুন সংস্করণ চলন্তিকা হাতে এল। এর পরিশিষ্ট ভাগে বাংলা ভাষার যেরকম সুসম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয়েছে এমন আর কোথাও দেখিনি। আমার বাংলা ভাষা পরিচয়ে আমার খেয়ালমতো বকে গেছি বৈঠকে বসে বুড়ো মানুষ আমাকে খেতে খেতে যেরকম প্রগল্‌ভতা করে যায় ও সেই রকম—শিক্ষা দেবার দায়িত্ব ওর নেই—তোমার বই পড়ে এই কথাটাই আমার বিশেষ করে মনে পড়ল। বাংলা ভাষার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় পেতে যে ইচ্ছা করবে তোমার বই ছাড়া তার গতি নেই।

ইতি ২৮. ২. ৩৯ তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'তোমার বই ছাড়া তার গতি নেই'—চলন্তিকা প্রসঙ্গে এর চেয়ে বড়ো কথা আর কি হতে পারে? কবি তাঁর 'বাংলা ভাষা পরিচয়ে'র ভূমিকায় বলেছেন ভাষার রহস্যের কথা। এই বইতে ভাষার যে রূপের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন কবি, সেটি চলিত ভাষা। এর কোন পাকাপাকি নিয়ম সর্বত্র গড়ে ওঠেনি, অথচ সেটি দরকার—তারই প্রচেষ্টা হিসেবে বইটি লিখেছিলেন কবি। এর মধ্যে তত্ত্বগত আলোচনা নেই, আছে ভাষাকে ভালবাসার তাগিদে আবিষ্কারের আনন্দ। অপর দিকে, 'চলন্তিকা'র পরিশিষ্টে বানান, ক্রিয়ারূপ প্রভৃতি নিয়ে

প্রচুর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। রাজশেখর বসু অবশ্য কবির চিঠির জবাবে লিখেছিলেন যে তিনি কবির 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের অনুসরণ করেছেন। কবির রচনায় বাংলা উচ্চারণ, স্বরবর্ণের ব্যবহার, প্রত্যয়, ক্রিয়াপদ, উপসর্গ—এসবের আলোচনা তো আছেই—অতিরিক্ত যা আছে তা হল ভাষা ব্যবহারের ইশারায় যে অর্থবহতা থাকে তার পরিচয়। কবির চোখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা দেখেছিলেন, রাজশেখর বসু ভাষাবিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে তাই করলেন 'চলন্তিকা'য়। বুদ্ধদেব বসু তাই সঠিক বলেছিলেন—'চলন্তিকার পরে তর্কাতীত হল যে বাংলা ভাষা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে।' রাজশেখর বসু বার বার তাঁর নানা প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথকে পাঠাতেন। সব সময়ে যে সমাধান চাইতেন এমন নয়, বিষয়টির প্রতি কবির সহানুভূতি কামনা করতেন তিনি। এইরকম একটি উদাহরণে তিনি কয়েকটি বানানের রূপ নিয়ে তাঁর সংশয়কে জানিয়েছিলেন—

'পাঠান' না 'পাঠানো'
'ছিল' না 'ছিলো'
'দিও' না 'দিয়ো'
'হিন্দী' না 'হিন্দি'
'ওকালতি' না 'ওকালতী'
'চুণ' না 'চুন'
'সহর' না 'শহর'
'ক্লাশ' না 'ক্লাস'
Ware এবং Wire—দুটোই ওয়ার কি না?
War—ওআর দোষ কি?

এ বানানগুলো এখনো যে নির্দিষ্ট হয়েছে, এমন বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথও তাঁর চিন্তার শরিক করতেন রাজশেখর বসুকে। বানান নিয়ে তাঁর লেখা একটি চিঠি এখানে উদ্ধৃত করি, এটি লেখা হয় ১৯।১০।৩৫-ত্র :

কল্যাণীয়েষু,

চারুবাবুর চিঠির উত্তরে বানান সম্বন্ধে যে পত্র লিখেছিলুম তার প্রতিলিপি তোমার কাছে পাঠাই। এই চিঠিতে আলোচিত বিষয়ের গুরুত্ব আমি বিশেষভাবে অনুভব করি। জানিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সায় পাব কিনা।

('সায় পাব কিনা'র স্থানে প্রথম খসড়ায় ছিল : মনের কী অবস্থা।) চারুবাবু

বলতে কবি সম্ভবত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকেই বুঝিয়ে থাকবেন। ১৯৩৪-এর ২৯শে সেপ্টেম্বর তাঁকে লেখা একটি চিঠিতে বাংলা বানান সম্বন্ধে কবির চিন্তার পরিচয় আছে। তার অংশ উদ্ধার করে দেখাই :

> ...বর্তমান বাংলা সাহিত্যে প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার ব্যাপকভাবেই চলেছে—আমার এই চিঠিখানিই তার একটি প্রমাণ—অন্তত চিঠি লেখায় সংস্কৃত বাংলা প্রায় উঠে গেছে বলেই আমার বিশ্বাস। বাংলা গদ্যসাহিত্যে এই প্রাকৃত ভাষার ব্যাপ্তি অনেকের কাছে রুচিকর না হতে পারে। কিন্তু একে উপেক্ষা করা চলবে না। এর বানান রীতি নির্দিষ্ট করে দেবার জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়কে অনেকদিন আমি অনুরোধ করেছি।

কবি যুক্তিসঙ্গতভাবেই বুঝেছিলেন যে এই রীতি নির্মাণের প্রশস্ত স্থান হল বিশ্ববিদ্যালয়। কোনো একজনের চেষ্টায় একে গড়ে তোলা সহজ নয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়েই ভাষাবিজ্ঞানীদের সমাবেশ, তাঁরাই এ কাজ করতে পারেন। সম্ভবত, কবি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সাড়া না পেয়ে চিঠির প্রতিলিপি বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে রাজশেখর বসুও এই চলিত ভাষার কথাই বলেছেন তাঁর ১৩।৭।৫৮ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে :

> সাধুভাষা অধিক শৃঙ্খলিত সেজন্য আয়ত্ত করা সুসাধ্য। চলিত ভাষায় শৃঙ্খলা আসতে বিলম্ব হতে পারে।... দুই ভাষার মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা। গত দশ বিশ বৎসরের বাঙলা রচনা দেখলেই বোঝা যাবে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলিত ভাষাই প্রাধান্য পাচ্ছে।

তাহলে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এতদিন পরেও এই বিতর্ক চলেছে। এখন দেখাই যাচ্ছে যে চলিত ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠেছে। তবে তার রীতিনীতি এখনো স্থির হয়নি। নানাজনের হাতে, নানা সাংবাদিকতায়, বানানের বা অন্যান্য আঙ্গিকে কোন সুষম নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তার জন্য আমাদের হয়তো আর একজন রাজশেখর বসুর অপেক্ষায় থাকতে হবে।

রাজশেখর বসুকে লেখা কবির ১৯।১০।৩৫-এ লেখা ঐ চিঠিতে আরো ছিল :

> বাংলায় ইটালিক্‌সের প্রয়োজন আছে। তার বিধান তোমাদেরি হাতে। এছাড়া বাংলা অক্ষরে বিশেষ বিশেষ স্থলে ইংরেজী ক্যাপিটল অক্ষরের প্রতিরূপ কিছু চালাতে না পারলে অসুবিধা ঘটে। একটা দৃষ্টান্ত দিই—যে কাল অবিরত বিচ্ছেদের বেদনায় সকরুণ—ইংরেজীতে এর একটা নিয়

> লিখিত তর্জমা হতে পারে—The time which is sad with the sadness of ceaseless separation—কিন্তু নিম্নপ্রকার তর্জমা যদি লেখকের অভিপ্রেত হয়—Time which is sad ইত্যাদি তবে বাংলার কি উপায় করা যাবে? বাংলা অক্ষরে নির্বিশেষ time এর চেহারা কি?
>
> ইতি তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯।১০।৩৫

বাংলা ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার খানিকটা সারবস্তু এই চিঠিটিতে আছে। তিনি যা চেয়েছিলেন, তার অনেকটাই বাকী রয়ে গেছে। ইটালিক্‌সের পরিবর্তে নিম্নরেখ বা ফাঁকযুক্ত অক্ষর দিয়ে কাজ চালানো হয়, এইমাত্র।

বাংলাভাষা সংক্রান্ত যে কোনো গবেষণা সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ নিরন্তর উৎসাহী ছিলেন। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৪শ বর্ষ সংখ্যার ধ্বনিবিষয়ক প্রবন্ধটি পড়ে কবি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখেছিলেন, 'আমিও এই বিষয়টা এইভাবে আলোচনা করিব বলিয়া একদিন স্থির করিয়াছিলাম, সেইজন্য আপনার প্রবন্ধের আরম্ভ ভাগ পড়িয়া মনে মনে আপনার সঙ্গে ঝগড়া করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তাহার পরে সমস্তটি পড়িয়া দেখিলাম, আমি এতটা পরিষ্কার করিয়া এবং এমন বিজ্ঞানসম্মত শৃঙ্খলার সহিত কখনও বলিতে পারিতাম না।'

এই চিঠিটি কবি লিখেছিলেন ১৩১৪ সালের ১১ই ফাল্গুন। এতে যদিও কবি বলেছেন যে 'বিজ্ঞানসম্মত শৃঙ্খলার সহিত' তিনি আলোচনা করতে পারবেন না, কিন্তু এ চিঠি লেখার ৭ বছর আগেই—১৩০৭ সালে তিনি এ বিষয়ে একটি সুন্দর আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' নামে সেই প্রবন্ধে বাংলা শব্দের ধ্বনিরূপের বিস্তৃত আলোচনা ছিল। প্রবন্ধটি পড়লেই সেকথা বোঝা যাবে, এবং উৎসাহী পাঠকের এটি পড়ে নিতে কোন অসুবিধে হবার কথা নয়। তথাপি খুঁজেপেতে পড়ার আগে, খানিকটা প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করি। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে এমন সব শব্দের তালিকা দিয়েছেন, যেগুলি অভিধানে পাওয়া যাবে না, অথচ তারা না থাকলে আমাদের অনেক বর্ণনাই অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে।

> শ্রুতিগ্রাহ্য নয় এমন অনুভূতিকে ধ্বনিরূপে ব্যক্ত করা—ধাঁ করিয়া, বোঁ করিয়া, ভোঁ করিয়া, গটগট করিয়া, সাঁ করিয়া চলিয়া গেল। সব কটিতেই 'দ্রুত-গতি প্রকাশ করিতেছে; অথচ ইহাদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা অন্য উপায়ে প্রকাশ করিতে গেলে হতাশ হইতে হয়।'

চলার বিচিত্র ছবি—খটখট করিয়া, খুটখুট করিয়া, খুটুস খুটুস করিয়া, গুটগুট করিয়া, ট্যাঙস ট্যাঙস করিয়া, থপ থপ করিয়া, ধাঁ ধাঁ করিয়া, সুট সুট করিয়া, হন হন করিয়া, হুড়মুড় করিয়া—ইত্যাদি।

পাতলা বা সরু বোঝাতে—পাতলা ফিনফিন করছে, ছিপছিপে চেহারা, লিকলিকে শরীর ইত্যাদি।

কোনো ঋতুর প্রাবল্য বোঝাতে। শরীরের বেদনা বোঝাতে—কনকনে শীত, কটকট, ম্যাজম্যাজ, ঝিনঝিন, দবদব, চড়চড় সুড়সুড় ইত্যাদি।

শূন্যতা, স্তব্ধতা বা নিঃশব্দতা বোঝাতে—খাঁ খাঁ, ঝাঁ ঝাঁ, ধূ ধূ, থৈ থৈ, হাঁ হাঁ, হু হু, ভোঁ ভোঁ ইত্যাদি।

বর্ণকে ধ্বনিরূপে প্রকাশ—টকটকে টুকটুকে রগরগে লাল, ধবধবে ফ্যাকফেকে সাদা, মিসমিসে কুচকুচে কালো। ম্যাড়মেড়ে। এই ধরনের উদাহরণ প্রবন্ধটিতে প্রচুর রয়েছে। বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি নিয়ে রীতিমত গবেষণা সুরু করেছিলেন।

এই ধরণের শব্দ রবীন্দ্রনাথ শুধু সংগ্রহই করেননি, তৈরী করতেও বসেছিলেন। ইংরেজীতে জেমস্ জয়েস কিছু শব্দ বানিয়েছিলেন, তার নাম হল পোর্টম্যান্টো শব্দ, যেমন—slithy, scuog—দুতিনটে শব্দ জুড়ে দিয়ে বানানো। রবীন্দ্রনাথ বানিয়েছিলেন এমন শব্দ, যার সংজ্ঞা তিনি নিজেই দিয়ে গেছেন—'শব্দের আপন কাজই হচ্ছে বোঝানো, তাকে আবার বোঝাবে কে?' তারপর দিয়েছেন নমুনা—'দিনরাত তোমার ঐ হিদ্‌হিদ্‌ হিদিক্কারে আমার পাঁজঞ্জুরিতে তিড়িতঙ্ক লাগে' —এর অর্থ ঐ ধ্বনিতেই স্পষ্ট। অথবা

'পাঠশালার পেডেণ্ডোকে দেখলেই তার আন্‌তারা যেত ফুসকলিয়ে। বুকের ভিতরে করতে থাকত কুডুক্কুর কুডুক্কুর।'

এই অদ্ভুত শব্দগুলোর কোনো অভিধানগত অর্থ নেই, কিন্তু পাঠকের বুঝতে অসুবিধে হয় কি? সে চট্ করে বুঝে নেয় পেডেণ্ডো মানে পণ্ডিত, আন্‌তারা মানে অন্তর, ফুসকলিয়ে বলতে ফুস করে দমে যাওয়া গোছের কিছু বোঝাচ্ছে, (মানেটা ঠিক মানে নয়, অনেকটা ইশারার মতো)—কুডুক্কুর তো খুবই সহজ, গুড়গুড় করে ওঠা। বাচস্পতির এই শব্দের ইংরেজী অনুবাদ শুনে ছোটোলাট পর্যন্ত টরেটম্ বনে গিয়েছিলেন।

এত খুঁটিনাটির দিকে রবীন্দ্রনাথ নজর দিয়েছিলেন, কারণ ভাষার রহস্যে তিনি বিস্মিত এবং মুগ্ধ হতেন। ভাষার শক্তির সন্ধান করতে গিয়েই তিনি

দৈনন্দিন জীবনের দিকে গভীর দৃষ্টি মেলেছেন। ১৯৩৫ সালের ১৭ই মে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখছেন,

> প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে একটি স্বচ্ছতা আছে তার মধ্যে দিয়ে অতুচ্ছ পড়ে ধরা, গদ্যের আছে সেই সহজ স্বচ্ছতা। তাই বলে একথা মনে করা ভুল হবে যে, গদ্যকাব্য কেবলমাত্র সেই অকিঞ্চিৎকর কাব্যবস্তুর বাহন। বৃহতের ভার অনায়াসে বহন করবার শক্তি গদ্যছন্দের মধ্যে আছে।… প্রশ্ন উঠবে গদ্য তাহলে কাব্যের পর্যায়ে উঠবে কোন নিয়মে। এর উত্তর সহজ। গদ্যকে যদি ঘরের গৃহিণী বলে কল্পনা কর তাহলে জানবে তিনি তর্ক করেন, ধোবার বাড়ির কাগজের হিসেব রাখেন…এরই ফাঁকে ফাঁকে মাধুরীর স্রোত উছলিয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামলী' 'পলাতকা' প্রভৃতি গ্রন্থের নানা কবিতার কথা মনে পড়ে যাদের মধ্যে কবি অনেক আপাত তুচ্ছতাকেই কাব্যের বিষয় করে নিয়ে তাকে অমর করে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে এমন আটপৌরে ভাব আছে, যাকে পদ্যের বাঁধনে বাঁধতে গেলে হয়তো স্বাভাবিকতা নষ্ট হ'তো। গদ্যে তাদের প্রকাশ হল অবারিত। ধূর্জটিপ্রসাদকে ঐ চিঠিতেই আরো বললেন,

> …অশোকের গাছে সে আলতা-আঁকা নূপুরশিঞ্জিত পদাঘাত নাই করল, না হয় কোমরে আঁট আঁচল বাঁধা, বাঁ হাতের কুক্ষিতে ঝুড়ি, ডান হাত দিয়ে মাচা থেকে লাউশাক তুলছে, অযত্ন শিথিল খোঁপা ঝুলে পড়েছে আলগা হয়ে, সকালের রৌদ্রজড়িত ছায়াপথে হঠাৎ এই দৃশ্যে কোন তরুণের বুকের মধ্যে যদি ধক করে ধাক্কা লাগে তবে সেটাকে কি লিরিকের ধাক্কা বলা চলে না, না হয় গদ্য লিরিকই হল।

এই অবহেলিত জীবন থেকে কুড়িয়ে আনা কবিতা 'শ্যামলী' কাব্যের 'সম্ভাষণ'-

বাঁধছিলে চুল আয়নার সামনে
বেণী পাকিয়ে পাকিয়ে, কাঁটা বিঁধে বিঁধে।
এমন মন দিয়ে দেখিনি তোমাকে অনেকদিন
দেখিনি এমন বাঁকা করে মাথা হেলানো
চুল বাঁধার কারিগরিতে
এমন দুই হাতের মিতালি
চুড়িবালার ঠুনঠুনির তালে।
শেষে ঐ ধানিরঙের আঁচলখানিতে

কোথাও কিছু ঢিল দিলে
আঁট করলে কোথাও বা···
আজ প্রথম আমার মনে হল
অল্প মজুরির দিন-চালানো
একটা মানুষের জন্যে
নিজেকে তো সাজিয়ে তুলছে
আমাদের ঘরের পুরোনো বউ···

কবি চিঠিতে যে বুকের মধ্যে 'ধক করে ধাক্কা লাগা'র কথা বলেছেন, এ সেই ধাক্কা। ভাষার সহজ সুরে এমন বলীয়ান হয়ে উঠল।

রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তপথে' কবিতাটি যদি লক্ষ্য করে দেখা যায়, তবে চোখে পড়বে কবি একেবারে জীবনযাপনের সরলতম ভূমিতে এসে দাঁড়াতে চাইছেন। যে পরিবেশ থেকে তিনি তাঁর মানসীকে খুঁজে পাচ্ছেন, তার আয়োজনে কোন ভূষণ নেই, কিন্তু সেইটিই হয়ে উঠছে অনুকূল উপাদান। কবিতার অংশবিশেষ পড়লেই আমরা সেকথা বুঝতে পারব :

পায়ে নূপুর নাই রহিল বাঁধা
নাচেতে কাজ নাই,
যে চলনটি রক্তে তোমার সাধা
মন ভোলাবে তাই।···
ভিজে শাড়ী হাঁটুর পরে তুলে
পার হয়ে যাও নদী,
বামুনপাড়ার রাস্তা যে যাই ভুলে
তোমায় দেখি যদি।
হাটের দিনে শাক তুলে নাও ক্ষেতে
চুপড়ি নিয়ে কাঁখে,
মটর কলাই খাওয়াও আঁচল পেতে
পথের গাধাটাকে।···
সতর্কতার দায় ঘুচায়ে দিয়ে
পাড়ার অনাদরে
এসো ও মোর জাতথোয়ানো প্রিয়ে
মুক্ত পথের 'পরে।

সত্যি সত্যি, কবি 'সতর্কতার দায়' ঘুচিয়ে দিচ্ছেন, ভাষায়, ভঙ্গীতে, পটভূমিতে হয়ে উঠছেন সহজ, স্বাভাবিক এবং নতুনভাবে প্রাণবন্ত।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে এ প্রসঙ্গে ১৯৩৫ সালের ২২শে মে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লিখেছিলেন, এবারে তার কথা বলি,

কল্যাণীয়েষু

গদ্য বলতে বুঝি যে-ভাষা আলাপ করবার ভাষা ; ছন্দোবদ্ধ পদে বিভক্ত যে-ভাষা তাই পদ্য। আর রসাত্মক বাক্যকেই আলঙ্কারিক পণ্ডিত কাব্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই রসাত্মক বাক্য পদ্যে বললে সেটা হবে পদ্যকাব্য আর গদ্যে বললে হবে গদ্যকাব্য।··· গদ্যকাব্যেও একটা আবাঁধা ছন্দ আছে···মুখের কথায় যখন আমরা খবর দিই তখন সেটাতে নিঃশ্বাসের বেগে ঢেউ খেলায় না, যেমন, 'তার চেহারাটা মন্দ নয়', কিন্তু ভাবের আবেগ লাগামাত্র আপনি ঝোঁক এসে পড়ে, যেমন, 'কী সুন্দর তার চেহারাটি', 'মরে যাই তোমার বালাই নিয়ে', 'এত গুমর সইবে না গো, সইবে না, এই বলে দিলুম'।

কথা কয়নি তো কয়নি
চলে গেছে সামনে দিয়ে
বুক ফেটে মরব না তাই বলে।

এ সমস্তই প্রতিদিনের চলতি কথার ছন্দ, গদ্যকাব্যের গতিবেগে আত্মরচিত। মনকে খবর দেবার সময় এর দরকার হয় না, ধাক্কা দেবার সময় আপনি দেখা দেয়, ছান্দসিকের মাপকাঠির অপেক্ষা রাখে না।

ইতি ২২ মে ১৯৩৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আবার সেই 'ধাক্কা লাগা'র কথা। রোজকার জীবনের আলোড়নকে প্রকাশ করবার জন্য কবিকে ঘরোয়া ভঙ্গীকেই ভাষার মধ্যে আহ্বান করতে হয়েছে। যিনি একদিন তরুর মর্মে ফুল ফোটাবার বেদনাকে তাঁর ভাষায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তাঁকে জীবনের সহজ কথা বলবার জন্য সরল ভাষাকেই শিক্ষিত করে তুলতে হল। তাঁর 'শেষসপ্তক' গ্রন্থে রয়েছে তাঁর জীবনের অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতার কথা। জীবনের অনেক স্মৃতি, অনেক বিস্মৃতি, অনেক চেতনা, অনেক বেদনা তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে, কথা বলিয়ে নিচ্ছে এক এক করে। যেমনটি ভাবছেন, প্রায় সেই রকমটাই বলে যাচ্ছেন তিনি। ভাষা হয়ে উঠছে সরল এবং ঋজু।

২. ১০. ৩৫ তারিখে সঞ্জয় ভট্টাচার্য কবিকে লেখেন,

আমার ধারণা ছিল গদ্যে জয়ঢাক বাজানোই চলে, বাঁশীর কাজ তাকে দিয়ে হয় না। আপনার 'শেষসপ্তক' পড়ে দেখলেম গদ্যের পুরু বাকল ভেদ করে ফুটে উঠেছে অজস্র ফুল…

সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'গদ্যছন্দ গদ্যকবিতা' নামে একটি প্রবন্ধও লেখেন গদ্যকাব্য বিষয়ে। তাতে বললেন, সকলেই মনে করছেন গদ্যকবিতা লেখা খুব সহজ, ছন্দের দিকে না তাকিয়ে সকলেই এখন শুধু গদ্য লিখেই গদ্যকবিতার কবি হয়ে উঠতে চাইছেন। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে যা করতে চেয়েছেন, সেটিকে অনেকের পক্ষেই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়নি।

গদ্যছন্দ সম্বন্ধে হিরণকুমার সান্যাল ১৩৪৩-এর কার্তিক সংখ্যা 'পরিচয়ে' লিখেছিলেন—তাঁর রচনাটি লেখা হয়েছিল 'পত্রপুট' এবং 'শ্যামলী' কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে—'কি কুক্ষণে জানিনা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশে গদ্য-কবিতার প্রবর্তন করেন। কাব্যজগতে এ অপসৃষ্টি… দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে …প্রধান আপত্তি ইহার অনির্দিষ্ট পরিধি… রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন এই কথা ঘোষণা করিবার জন্য—ইহা না লেখাই ভালো, কিন্তু নিতান্তই যদি লিখিতে চাও, এইভাবে লিখিয়ো।'

বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা'র ১৩৪৩ চৈত্র সংখ্যায় এই সমালোচনাকে 'কাপুরুষ কপটতা ও হাঁটুভাঙা স্তাবকতা' আখ্যা দেন। ৩. ১১. ৩৬ তারিখে তিনি রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখে গদ্যছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ ৬. ১১. ৩৬ তারিখে তার উত্তরে লেখেন—'গদ্যকাব্য সম্বন্ধে তর্ক না করে যথেচ্ছা লিখে যাওয়াই ভালো। আজ যারা আপত্তি করছে কাল তারা নকল করবে।'

রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন যে অনেক কথা আছে যা একমাত্র গদ্যছন্দেই প্রকাশিত হতে পারে। যখন ভাষা ছিল না, মানুষের ভাবনাও কম ছিল। 'বাঁশি' কবিতার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে কিনু গোয়ালার গলির কথা গদ্যছন্দ ছাড়া বলাই যেত না। গদ্যকাব্য নাচে না, চলে। সহজে চলে বলেই তার গতি সর্বত্র।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে বলেছেন যে গদ্য-পদ্যের বিবাদ রবীন্দ্রনাথের অধ্যবসায়ে হয়তো ঘুচলো। কিন্তু তপস্যাকঠিন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যেটা মোক্ষ, আমাদের ক্ষেত্রে তা হয়তো সর্বনাশের সূত্রপাত।

আধুনিক কবিতার নতুন গতিপ্রকৃতির দিকে তাকিয়ে এ মন্তব্যটি মনে রাখা দরকার হতে পারে।

বঙ্কিমের গদ্যের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে ক্রমশঃ তাঁর প্রয়োজনে ভাষাকে কেমন বদলাচ্ছিলেন তিনি। 'দুর্গেশনন্দিনী' যে ভাষায় লিখেছেন, 'ইন্দিরা' সে ভাষায় লেখেননি। অর্থাৎ বিষয় অনুযায়ী ভাষা গঠিত হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ ভাষার এই পরীক্ষাটা ব্যাপকভাবে সুরু করলেন। ১৯।২০ বছর বয়সে একবার এই মুখের কথা বাল্মীকিপ্রতিভায় দস্যুদলের সংলাপে লাগিয়েছিলেন। তবে তাতে সুরের দাপট ছিল, আলাদা করে ভাষার পরীক্ষাটা খুব একটা নজরে আসেনি। তারপরে এই চেষ্টা স্থগিত ছিল। কবি সাহিত্যে চলতি ভাষা আনলেন প্রমথ চৌধুরীর প্রেরণায়। প্রমথ চৌধুরীর নিজের ভাষায় ছিল উইটের প্রাচুর্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সুরু করলেন চলতি ভাষা, আর পিছন ফিরে তাকান নি। দ্রুত পরীক্ষার পর পরীক্ষা করে গিয়েছেন।

মা কেঁদে কয়, "মঞ্জুলী মোর ঐ তো কচি মেয়ে
ওরি সঙ্গে বিয়ে দেবে?—বয়সে ওর চেয়ে
পাঁচগুণো সে বড়ো
তাকে দেখে বাছা আমার ভয়েই জড়োসড়ো।
এমন বিয়ে ঘটতে দেব নাকো!
বাপ বললে, কান্না তোমার রাখো
পঞ্চাননকে পাওয়া গেছে অনেক দিনের খোঁজে
জান না কি মস্ত কুলীন ওযে!

দুটোই কথা বলার ঘরোয়া ভঙ্গী—তবু মায়ের কথায় যে বেদনা, আর বাপের কথায় যে তাচ্ছিল্য—দুটোই ফুটে উঠেছে ভাষা প্রয়োগে। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'তে প্রতিবেশী মহিলাদের কথোপকথনের একটি নমুনা পেশ করি, ভাষা নেমে এসেছে পথের ধুলোয়।—অন্যথায় রবীন্দ্রনাথ পরিশীলিত শব্দ ব্যবহার করেন, এখানে কিন্তু সেরকম নয়, তাঁর হাতে 'মাগী' পর্যন্ত ব্যবহৃত হচ্ছে।

—শুধু একজোড়া রতনচক্র।
—বিধি আজ তোরে বড়ই বক্র।
এত ঘটা করে নিয়ে গেল ডেকে
ভেবেছিনু দেবে গয়না গা ঢেকে।

—মেয়ের বিয়েতে পেয়ারী বুড়ি
পেয়েছিল হার, তাছাড়া চুড়ি।
—আমি যে গরিব নই যথেষ্ট
গরিবিয়ানায় সে মাগী শ্রেষ্ঠ।
অদৃষ্টে যার নেইকো গয়না
গরিব হয়ে সে গরিব হয় না।
—বড়োমানুষের বিচার তো নেই।
কারেও বা তাঁর ধরে না মনেই
কেউ বা তাঁহার মাথার ঠাকুর।
—টাকাটা সিকেটা কুমড়ো কাঁকুড়
যা পাই সে ভালো, কে দেয় তাই বা।
—অবিচারে দান দিলেন নাই বা।

সংলাপগুলি বেশ কাটা কাটা, উঠছে পড়ছে। শ্লেষ, ক্ষোভ, ঈর্ষা, সবই ধরা পড়ছে রোজকার মুখের কথায়।

এই মুখের কথা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ প্রহরে লিখলেন 'ছেলেবেলা'—তাঁর প্রথম প্রহরের স্মৃতিচারণ। সে ভাষার চেষ্টাহীন ঐশ্বর্য দেখে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লিখলেন,

…আপনার অন্যান্য রচনার তুলনায় ছেলেবেলার ভাষাও অগভীর : রাবীন্দ্রিক উপমাবিলাস তাতে প্রায় নেই ;… আপনার শ্রেষ্ঠ গদ্যের মধ্যেও ছেলেবেলার তুলনা নেই… এ গদ্যকে অগভীর বলেছি, কারণ এটা একেবারে গদ্য, এতে পদ্যোচিত অলঙ্কারের লেশমাত্র নেই। মুখের কথা এ গদ্যের আদর্শমাত্র নয়, এর প্রাণ।… ফলত এ গদ্য পড়ে ধিক্কারবোধও অনিবার্য : এর পরে লিখে কি হবে ?

এইভাবে প্রতিমুহূর্তে নিজেকেই নিজে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, নিজের এবং অন্যান্যদের ভাষার সমস্ত প্রয়াসই তিনি সচেতনভাবে লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠছিল আর সকলের পক্ষে। হয়তো এইজন্যই বিষ্ণু দে'র কবিতা তাঁর পছন্দ হয়নি, কারণ এতে আতিশয্য আছে। কবি নিজে যেমনভাবে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিলেন ভাষার প্রকাশভঙ্গীকে, তার তুলনায় বিষ্ণু দে'র কবিতা অবোধ্য লেগেছিল তাঁর। বুদ্ধদেব বসুকে বলেছিলেন, এর কবিতা যদি বুঝিয়ে দিতে পার তো শিরোপা দেব।

রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় লিখতে লাগলেন, ক্রমে সেইটিই হয়ে উঠল বাঙালির আধুনিক ভাষা, কথ্যবাংলার সমস্ত স্বাভাবিক ভঙ্গীকে ব্যবহার করে তিনি দেখিয়ে দিলেন তাঁর স্বদেশবাসীর ভাষা কতটা জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে। একসময়ে মনে হতো, তিনি যেন অনেক বেশি কথা বলে আমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলছেন। এখন সেই অতিকথন একেবারে চলে গেল তাঁর রচনা থেকে। সংহত হয়ে উঠল তাঁর বক্তব্য। বেশি কথা সাজাবার আর প্রয়োজনই হচ্ছে না তাঁর, ঠিক কথাটি ঠিক ঠিক তাঁর কলমে জুগিয়ে দিচ্ছে কেউ। ছন্দের অলংকার ত্যাগ করেও সুন্দর হতে বাধা ঘটছে না। পুরাকালে নাকি গ্রীসদেশে মেয়েদের সৌন্দর্য বিচার করার সময়ে কোনো সজ্জা বা প্রসাধন থাকতো না, স্নান করে নগ্ন শরীরে তারা এসে দাঁড়াতো বিচারকের সামনে। রবীন্দ্রনাথের ভাষাও সেইরকম নিরাবরণ হয়েই অপরূপ হয়ে উঠল।

রাজশেখর বসুর প্রসঙ্গ দিয়ে আলোচনা সুরু করেছিলাম, আমাদের শেষও করতে হবে তাঁকে দিয়েই। তবে তার আগে আর দু'একটি কথা বলতে হবে।

ভাষার যত সম্প্রসারণ ঘটেছে, তত রচনার বিষয়বস্তুও নতুন নতুন হয়ে উঠেছে। রচনার মধ্যে যুক্তির প্রসার দেখা যাচ্ছে। বঙ্কিমের প্রবন্ধেও—যেমন কমলাকান্ত, লোকরহস্য ইত্যাদি—যুক্তিকে উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথে এটি ভাষার অন্যতম উপকরণ হয়ে উঠেছিল। যেমন, তাঁর 'সমাজ' পুস্তকের মধ্যে আছে :

আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি—ইচ্ছা করিলে আমি অন্য সম্প্রদায়ে যাইতে পারি, কিন্তু অন্য সমাজে যাইব কি করিয়া। সে সমাজের ইতিহাস তো আমার নয়। গাছের ফল এক ঝাঁকা হইতে অন্য ঝাঁকায় যাইতে পারে, কিন্তু এক শাখা হইতে অন্য শাখায় ফলিবে কি করিয়া।

যুক্তিকে উপমার সাহায্যে সরস বোধগম্য করা হয়েছে এখানে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'ফলিত জ্যোতিষ' প্রবন্ধটি থেকে খানিকটা পড়া যাক :

…প্রথমে তাঁহাদের প্রতিপাদ্য নিয়মটা খুলিয়া বলুন।… ধরি মাছ না ছুঁই পানি হইলে চলিবে না। তাহার পর হাজার খানেক শিশুর জন্মকাল ঘড়ি ধরিয়া দেখিয়া প্রকাশ করিতে হইবে ; এবং… ফলাফল স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ করিতে হইবে… হাজারখানা কোষ্ঠীর মধ্যে যদি নয় শ' মিলিয়া যায় তবে

মনে করিতে হইবে ফলিত জ্যোতিষে অবশ্য কিছু আছে। যদি পঞ্চাশখানা মাত্র মেলে তবে মনে করিতে হইবে, তেমন কিছুই নাই।··· কেবল নেপোলিয়নের ও বিদ্যাসাগরের কোষ্ঠী বাহির করিলে অবিশ্বাসীর বিশ্বাস জন্মিবে না।

এই রচনাটিতে পরিসংখ্যান শাস্ত্রকে কাজে লাগানোর কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে শেষ পংক্তিতে তির্যক বিদ্রূপ বক্তব্যকে সরস করেছে।

রাজশেখর বসুর হাতে বাংলা ভাষা হয়ে উঠল কাজের ভাষা। রবীন্দ্রনাথের পরে রাজশেখরই একাধিক বিষয় নিয়ে বড়ো মাপের কাজ করেছিলেন। সাহিত্য তাঁর কাছে কাজের গুরুত্ব নিয়েই দেখা দিয়েছিল। এইজন্য তাঁর রচনায় জীবন-যাপনের দিক থেকে অনেক কাজের কথার দেখা মিলবে। তাঁর ছোট ছোট প্রবন্ধে তিনি সমাজের নানা দিক নিয়ে কথা বলেছেন—জাতিচরিত্রই হোক, কি ভাষার গতিই হোক, অথবা ভাষার বিকার-ই হোক—সব দিকেই তাঁর যুক্তিবাদী দৃষ্টি এবং অনুরূপ প্রকাশ তাঁর ভাষায়। একসময়ে এই সমস্ত রচনা প্রকাশে তাঁর দ্বিধা ছিল, তবু শেষ পর্যন্ত তাঁর মনে হয়েছে যে "বাঙালী পাঠকের রুচি আজকাল প্রসারিত হয়েছে" এবং এই প্রবন্ধগুলি "অন্তত জনকয়েকের চিন্তার খোরাক যোগাবে।" এই রুচি যে প্রসারিত হয়েছে, তার জন্য রাজশেখরের ভাষার দান কম নয়। লক্ষ্য করতে হবে, বাঙালী এখন "চিন্তার খোরাক" চাইছে। রাজশেখর অনেকাংশে এই চিত্রকে প্রস্তুত করেছেন। তাঁর 'বাংলা ভাষার গতি' থেকে একটু পড়ি :

'সাধু ভাষা এখনও টিকে আছে, তার কারণ চলিত ভাষার যথেচ্ছাচার দেখে বহু লেখক তা পরিহার করে চলেন। বল্ল, দিলো, কোর্চ্ছে, প্রভৃতি অদ্ভুত বানান, এবং কারুরকে, তাদেরকে, ঘরের থেকে প্রভৃতি গ্রাম্য প্রয়োগ বর্জন না করলে, চলিতভাষা সাধুর সমান দৃঢ়তা ও স্থিরতা পাবে না।'

ভাষায় এই যথেচ্ছাচার সম্বন্ধে রাজশেখরের এই সতর্কবাণী নিয়মিত উচ্চারিত হয়েছে। এখনো ভাষায় এই যথেচ্ছাচার চলে, তার কারণ কোন লেখকই আর শিক্ষার দিকে মন দেন না। চলিতভাষা অবশ্য ক্রমশই স্থায়ী হয়ে উঠছে, কিন্তু এ ভাষার যে উন্নতি আশা করা গিয়েছিল, তা হয়েছে বলে মনে করা যায় কি? তাঁর 'জাতিচরিত্র' প্রবন্ধের আলোচনাও উল্লেখযোগ্য :

নানা বিষয়ে এদেশের লোকের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হয়ে আছে। নেপালবাবার দৈব ঔষধের লোভে অসংখ্য লোকের কষ্টভোগ আর কুম্ভস্নানপুণ্যের দুর্বার

আকর্ষণে বহু লোকের প্রাণহানি এই মোহের ফল।··· আমাদের যেটুকু পুরুষকার আছে দৈবের উপর নির্ভর করে তাও বিনষ্ট হচ্ছে।

খুব কাটাকাটা কথা, একেবারে মর্মভেদী। রাজশেখর বসুর এই বিশেষত্ব ছিল বলেই বাংলা ভাষায় এমন কর্মক্ষমতা এসেছে। রাজশেখর বসু তাঁর যুক্তিগ্রাহ্য মতামত অতি তীক্ষ্ণ ভাষায় প্রকাশ করতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথের গোরার চিত্তের বিবর্তন রাজশেখর একটি মাত্র বাক্যে দক্ষতার সঙ্গে উপস্থিত করেছিলেন এই বলে—"গোরা নিজেকে ইওরোপীয় জানতে পেরে প্রথমে স্তম্ভিত তার পরে নিশ্চিন্ত হয়েছিল।" 'স্তম্ভিত' আর 'নিশ্চিন্ত', কেমন অনায়াসে পাশাপাশি কাজে লাগিয়েছেন।

বাংলা ভাষার এই বিভিন্ন পরিচয় থেকে এ কথা স্পষ্ট যে এই ভাষার পরিধি এখন বৃদ্ধি পেয়েছে। বিষয়ের নতুনত্ব, প্রকাশের প্রাচুর্য একে নতুন মহিমা দান করেছে। আমাদের আলোচনায় সব দিকের কথা বলা হয়েছে এমন নয়, তবু এর মধ্য থেকে যদি বাংলা ভাষার রহস্য সন্ধানে কেউ উৎসুক হন, তবে এই আলোচনার প্রাথমিক কাজটুকু সফল হয়েছে বলতে হবে। বলতে হবে যে বাংলা ভাষার আপন বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমরা মনোযোগী হতে পারছি।

ভবিতব্যের গল্প (উদাচী গোষ্ঠ)

শংকরনারায়ণ নবরে

অনুবাদ : ঝরা বসু ও উষা চাকী

শ্যামরাও ভাউ-এর হাত দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কুষ্ঠি আছে ? আমাকে একটু দেখাবেন ?'—ভাউ ওর কুষ্ঠিটা এনে দেখাল।

—ছাত্র হিসেবে দেখছি। এটা আমার পেশা নয়। দেখতে ভাল লাগে তাই দেখি।

—তাহলে এই কুষ্ঠিতে—

—নতুন শিখবার মত কিছু নেই—আবার আছেও বলা চলে।

—তার মানে ?

—আমাদের এই শাস্ত্র অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। এই জগতে কখনও কখনও একই রকম হাত দেখা যায়—একই জন্মপত্রিকাও পাওয়া যায়। যাদের হাতের রেখা এক রকমের হয় তাদের জীবনের ঘটনাতেও মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রেখায় রেখায় যাদের মিলে যায় তারা একই রকম জীবনচক্রে আবর্তিত হয়। এ সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকেই হাতের রেখার শাস্ত্র তৈরী হয়েছে।

—কিন্তু আমার কুষ্ঠিটা কেমন দেখলেন ?

—হ্যাঁ, বলছি। আপনার হাতের মত হাত যার আছে সেই মানুষটি আপনার মতই জীবন কাটাচ্ছে। কিংবা কাটাবে। সে হয়তো আফ্রিকাতে আছে, কিংবা সিঙ্গাপুরে—কিংবা ভারতে। হয়তো নয়, আছেই। আমি এমন একটি লোককে জানি যার কুষ্ঠির সঙ্গে আপনার কুষ্ঠির হুবহু মিল আছে। এবং সেই লোকটি এ দেশেই আছে। দশ-বারো বছর আগে আমি কোলাপুরে গিয়েছিলাম। সেখানে একজনের হাত দেখেছিলাম। আপনার হাতের মত—একেবারে রেখায় রেখায় মিল। ঠিক একই রকম জন্মপত্রিকা। এই রকম মিল দেখে আমি খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি। এতে বোঝা যাচ্ছে—ঐ ভদ্রলোকের জীবনের প্রতি ঘণ্টা যেভাবে কেটেছে আপনার জীবনও ঠিক সেই ভাবে কাটবে।

…শ্যামরাও ও ভাউ-এর আলাপ ট্রেনে। একই ট্রেনে দুজনে যাতায়াত করে। ওরা গল্প করতে করতে যায়। একদিন ওরা ট্রেনে কথাবার্তা বলছিল। এই সময়ে পাশের লোকেরা হাত দেখা ও জ্যোতিষ শাস্ত্র নিয়ে তর্ক জুড়েছিল। সেই আলোচনাটি বেশ জমে উঠেছিল। 'এই শাস্ত্র মিথ্যে'—এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তখনই শ্যামরাও বলে উঠেছিল, 'মাপ করবেন, আপনাদের আলোচনার মাঝখানে বলা উচিত নয়—তবুও বলছি। এই জ্যোতিষ শাস্ত্রের ছাত্র হিসেবে কিছু বলতে চাই। বলব কি ?'

—নিশ্চয়ই ! নিশ্চয়ই !

—হাতের রেখার শাস্ত্র কিন্তু মিথ্যে নয়। আপনাদের মধ্য থেকে যে কেউ এসে আমাকে হাত দেখান আর আমার কথা মিলিয়ে নিন। একজন এসে হাত দেখাল। শ্যামরাও লোকটির অন্য হাতটাও টেনে নিল। দুটো হাত নির্জীব বস্তুর মত উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল। বলল, 'আপনার চার বছর আগে বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়েতে আপনি অনেক পণ নিয়েছেন।'

—ঠিকই বলেছেন—আরও বলুন কিছু।

—বিয়ের এক বছর পরে আপনার ডিভোর্স হয়। লোকটি হাত সরিয়ে নিল। আর একজন ওর দুটো হাত এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এবারে আমার হাতটা দেখুন।' শ্যামরাও হাত দেখে বলল, 'আপনি কিছু আগে একটা খারাপ খবর পেয়েছেন। ঠিক কিনা ?'

—ঠিকই বলেছেন। কিন্তু কি খবর সেটা বলতে পারবেন কি ?

—হুঁ, বলছি। আপনার চাকরীটা চলে গেছে।

—সত্যি আপনি ঠিকই বলেছেন।

—এবারে দেখুন—আমি কবে চাকরী পাব—চেষ্টার ত্রুটি রাখছি না।

—দুই এক মাসের মধ্যে পেয়ে যাবেন—এর থেকে ভাল চাকরী। দু মাস বাদে দেখা করে আমাকে জানাবেন। আর তখনই আপনাদের আজকের আলোচনা—এই শাস্ত্র সত্যি কি মিথ্যে তা বুঝতে পারবেন।

…শ্যামরাও যে রকমটি বলেছিল সেই লোকটি কিন্তু ঠিকই একটা চাকরী পেয়েছিল।

তখন থেকেই ভাউ শ্যামরাওকে নিজের হাত ও কুষ্ঠি দেখাবার জন্য ওর বাড়ীতে ডাকাডাকি করছিল।… 'আপনার হাতের সঙ্গে কোলাপুরের এক ভদ্রলোকের হস্তরেখার মিল আছে।'—একথা শোনার পর থেকেই ভাউ অস্থির

হয়ে পড়েছিল। শ্যামরাও চলে গেলেও ভাউ মাথা থেকে ব্যাপারটি তাড়াতে পারছিল না।

—আমি আর একজনের জীবনের মার্গ অনুসরণ করে চলেছি। সেই মানুষটি আমার আগে আগে এগুচ্ছে—আর আমি ওকে অনুসরণ করে চলেছি। ঐ পথে আমাকে পা ফেলে ফেলে যেতে হবে।

হঠাৎ ওর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। যদি আমি লোকটির সঙ্গে দেখা করি? সে যদি আমার থেকে দশ বছরের বড় হয় কিংবা যদি একদিনেরও বড় হয় তবে আমি আগামী দিনগুলির কিংবা একদিনেরও ভবিষ্যৎ জানতে পারব। কালকে কি ঘটবে তা আমি জানতে পারব। যে জীবন সে কাটিয়ে এসেছে—তার সেই উচ্ছিষ্ট জীবন আজকে আমি কাটাচ্ছি। আর আমার যা আগামী দিনের জীবন হবে—লোকটি তা আজকে কাটাচ্ছে। কিন্তু সেই লোকটি কোথায়? আমার জীবনের রেখা ধরে সে এগিয়ে চলেছে আগে আগে। সে ব্যক্তিটি কোথায়? তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে···। আগামীকালকে আমার হাতের মুঠোয় চাই আমি। যেটা আমার ভবিতব্য তা আমি এই বর্তমানে বসেই জানতে চাই।

সেই রাত্রিতেই ভাউ শ্যামরাওয়ের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল। দরজা ধাক্কা দিল।

—কে?

—আমি ভাউ।

—এ্যা, এত রাত্রিতে?

—হ্যাঁ খুব জরুরী কাজ আছে।

—শ্যামরাও দরজা খুলে দিল। ভাউ জিজ্ঞেস করল, 'দুপুরবেলায় যে কথাটা বলেছিলেন—সেটা কি সত্যি?'

—কি বিষয়ে?

—যে দুজন লোকের ভাগ্য একই রকম হবে—যাদের হাত ও কুষ্ঠি একই রকম তারা একই ভাবে জীবন কাটায়—ঐ কথাটা।

—সে তো সত্যিই—কিন্তু এত রাত্রে একথা কেন?

—আমার হাত কোলাপুরের একটা লোকের হাতের মত। আমাদের কুষ্ঠিও এক—এটাও কি সত্যি?

—হ্যাঁ, তাও তো সত্যি।

—তার মানে ওর জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের প্রতি মুহূর্তের মিল আছে?

—হ্যাঁ।

—ওই ভদ্রলোকের ঠিকানাটা আমার চাই। ওকে আমি খুঁজে বের করব। আমি এত রাতে এসেছি।

—কিন্তু আমি ভাবছি··· এইরকম করলে···

—তা যা হবে সে দেখা যাবে—যা হবার তা তো ঐ লোকটি নিশ্চয়ই দেখে নিয়েছে। আমি ওর ঠিকানা চাই। আপনার পায়ে পড়ছি ওর ঠিকানাটা আমাকে দিন।

—না··· না এসব কি করছেন—ঠিকানাটা আমার স্পষ্ট মনে নেই। এত মিনতি করতে হবে না।

—আমাকে শুধু—ঠিকানাটা দিন।

—শ্যামরাও চশমা না পড়েই একটা কাগজের উপর বড় বড় অক্ষরে কিছু লিখে দিল। অস্পষ্টভাবে মনে করতে পারল কিছু। সেটা ছিল দশ-বারো বছর আগে জুলাই মাসের একটা ঘটনা—কোলাপুরে অন্নু গর্দের কাছে ঐ ভদ্রলোকটি এসেছিল—দু-তিন দিন ওখানে ছিল··· খুব সম্ভবতঃ ওর পদবীটি ছিল অষ্টেকর।

···বাড়ীতে এসে ভাউ সাবিত্রীবাঈকে সব বলল—ওর প্ল্যানটাও বলে ফেলল—'আগামীকালের ঘরের চাবি পেয়ে গেছি। কালকে গিয়ে অন্নু গর্দেকে ধরব। তারপর অষ্টেকরকে খুঁজে বের করব।'

—কিন্তু আমি ভাবছি কাজটা ঠিক হবে না। তুমি এমন করছ কেন? ভবিষ্যৎ জেনে সুখী হয়েছে এ পর্যন্ত আমি অন্ততঃ কোথাও শুনি নি।

—বাজে বকবক করো না। আমি যাব ঠিক করেছি যাবই।

—যদি আমার কথা শোন তো বলি···

—না তোমার কথা কিছু শুনবো না আমি। ঠিক করেছি আমি কালকে কোলাপুরে যাব।

···পরের দিন ভাউ ট্রেনে চেপে বসল। ট্রেন চলতে সুরু করলে ভাউ পকেট থেকে চিরকুটটা বের করল—বার বার পড়ে দেখল অষ্টেকরকে ধরতেই হবে।

কোলাপুরে পৌছন অবধি এ চিরকুটটা যে কতবার পড়েছে সে ভাউই জানে। অন্নু গর্দেকে ভাউ খুঁজে পেয়েছিল। তাকে শ্যামরাও-এর পরিচয় দিয়ে আলাপ জমিয়ে নিয়েছিল। খাওয়াদাওয়ার পর সে আসল কথাটা পাড়ল।

'দশ-বারো বছর আগে অষ্টেকর নামে কোন ভদ্রলোক এখানে এসেছিল কি ?' 'কিছু মনে পড়ছে না। কি রকম দেখতে ছিল বলুন তো ? চেহারায় কোন বৈশিষ্ট্য আছে কি ?'

—ও সব জানি না। কিন্তু সেই সময়ে আপনার কাছে শ্যামরাও এসেছিলেন। উনি অনেক লোকের হাত দেখেছিলেন। কুষ্ঠি বিচার করেছিলেন—তাদের মধ্যে ঐ অষ্টেকরও ছিল।

একটু একটু মনে পড়ছে। অষ্টেকরের হাত শ্যামরাও দেখছিলেন··· সবাইকে ঠিক ঠিক বলে অবাক করে দিচ্ছিলেন—অষ্টেকর আশেপাশের কোথাও থেকে এসেছিলো। শ্যামরাও ওর হাত দেখে বলেছিলেন—'অনেক বছর ধরে আপনি দুঃখকষ্টে ভুগছেন। আপনার নামে একটা মিথ্যা কলঙ্ক দেওয়া হয়েছিল—সেটা মিটে গেছে কি ?'—আর ঠিক তখনই অষ্টেকর চমকে উঠেছিল।

—সে সব আমি জানি না। কিন্তু ঐ লোকটির সঙ্গে আমার খুব জরুরী কাজ আছে।

—আমাকে বলা যায় ?

—এটা একেবারেই ব্যক্তিগত কিন্তু খুব দরকারী।

···দু-চারদিন ঘোরাঘুরির পর ভাউকে একজন বলল—'সোজা চলে যান—পোস্টাপিসের সামনে একটা সবুজ বাংলোবাড়ী দেখতে পাবেন—ঐটাই অষ্টেকরের বাড়ী। বাবা সাহেব অষ্টেকর বললেই সবাই দেখিয়ে দেবে।' 'ওর নাম করলেই সবাই দেখিয়ে দেবে'—কথাটা ভাউ মনে মনে আউড়ে নিল।

যেরকম ওকে বলা হয়েছিল সেই রকমই সবুজ বাংলো দেখতে পেল। বাইরের নেম প্লেটে নামটি দেখে নিল। দরজার কাছে একটা বড় কুকুর।

আমার জীবনও তো অষ্টেকরের মতই হবে। আমারও এরকম বাংলো, এরকম ঐশ্বর্য—ভাউ নিজের ভবিষ্যৎ দর্শন করে খুব খুশী হল।

ভাউ ধীর পায়ে গেট খুলে ভেতরে ঢুকল। কুকুরটি ডেকে উঠল। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বেরিয়ে এল।

—নমস্কার! আমার নাম ভাউ দাবকে। আমার একটা ব্যক্তিগত কাজে আপনার কাছে এসেছি।

—বসুন। চা-টা কিছু চলবে ?

—আপত্তি নেই।

ভাউ নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে লাগল। এক দিনের নয়, অন্ততঃ কুড়ি-পঁচিশ

বছরের ভবিষ্যৎ ও জানতে পারবে। বাবা সাহেব ওর থেকে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছরেরই তো বড় হবে মনে হয়। পঁচিশ বছর বাদে এরকম টুম্‌দার* (ছোট্টসুন্দর) বাংলো, এই ঐশ্বর্য, এরকম ঠাটবাট—কিন্তু এত সব কি করে হবে ?—আমি তো একজন সাধারণ ক্লার্ক। পঁচিশ বছরের চাকরীর একটা পয়সাও খরচ না করে জমালেও এত ঐশ্বর্য আমার হবে না। তবে কি লটারী··· গুপ্তধন।···

'আপনি আমার কাছে এসেছেন···' বাবাসাহেব না, যেন ভবিষ্যৎ প্রশ্ন করছে।

—আপনি কি দশ-বারো বছর আগে কোলাপুরে গিয়েছিলেন ? অন্ন, গর্দের কাছে ?

বাবাসাহেব একটু হাসলেন। বললেন, 'হ্যাঁ।'

—ওখানে যে একটি ভদ্রলোক এসেছিলেন তাকে কি আপনি হাত দেখিয়েছিলেন ? আপনার কুষ্ঠি···?

—মিলেছে, সব মিলেছে। সে ভদ্রলোক যখন আমাকে বলেছিল তখন আমি খুব চমকে গিয়েছিলাম। কিন্তু যেমনটি বলেছিল ঠিক তেমনি আমার এই দশ-বারো বছরে ঘটেছে। যে সব আমি কোনদিনও কল্পনা করতে পারি নি সেসব আমার জীবনে ঘটে গেল।

—সত্যি ! আমি ওনার কাছ থেকেই এসেছি।

—কি জন্যে ?

—আপনার কুষ্ঠিটা একটু দেখাবেন ? বাবাসাহেব পত্রিকা এনে দেখালেন। ভাউও নিজের পত্রিকা বের করে মিলিয়ে নিল। দুটোই এক।—'আমার ও আপনার জন্মপত্রিকা একদম এক। এরকম মিল খুব অল্পই দেখা যায়। তার মানে আপনার ও আমার জীবন একই রকম ভাবে কাটবে। শ্যামরাও ও এসব কথা বলেছিল আমাকে।

—তার জন্যই আপনি এখানে এসেছেন ? তাই তো ?

—হ্যাঁ ঠিক তাই। আপনি যে পথ দিয়ে গেছেন সে পথ দিয়ে আমাকে এগুতে হবে। আজকে আপনি যেখানে আছেন আমি পঁচিশ বছর বাদে গিয়ে সেখানে পৌছব।

* টুম্‌দার=মারাঠী শব্দ অনুবাদ না করে রাখা হয়েছে। বাংলা ভাষায় শব্দটির প্রবেশ ঘটলে আপত্তি কি ?

—না, না—এটা শুনে আমার খুব খারাপ লাগছে। আমি যে যে ঘটনাগুলি পার হয়ে এসেছি—সেগুলি আবার ঘটবে। আপনাকে এসব ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে…। আপনি সেগুলি কেন জানতে চাইছেন? পঁচিশ বছর বাদে কি হবে তা তো আপনি জানতে পারলেন, তাতেও আপনার মন মানছে না। এই বয়সে আপনিও আমার মত সুখী হবেন। দুটি কৃতি সন্তান, নিজের বাড়ী, অনেক বিষয় সম্পত্তি। এতটুকু জেনে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারছেন না।

—এর উত্তরটা তো আপনি দেবেন। আপনি যখন আমার বয়সী ছিলেন তখন আপনার মনোভাব কিরকম ছিল—সেটা মনে করুন তো।

—সেই সময়ে আমিও ভবিষ্যৎ জানবার জন্য এক ভদ্রলোকের কাছে গিয়েছিলাম। তার সঙ্গে আমার পঁচিশ বছরের তফাৎ ছিল।… আপনার মতই আমার মনে জিজ্ঞাসা জেগেছিল। আর মজার কথা এই আজকে আপনাকে আমি যা বলছি ঐ লোকটিও আমাকে তাই বলেছিল। আপনি যা বলছেন আমিও তাই বলেছিলাম। একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আবার পঁচিশ বছর বাদে আপনার কাছে আবার কেউ আসবে তার ভবিষ্যৎ জানবার জন্যে। যে কথাটা আমি এখন আপনাকে বলছি সেটা আপনি তখন তাকে বলবেন। আমাদের মত জন্মপত্রিকা যাদের আছে তাদের ঠিক এমন ভাবেই ভুগতে হবে।

—তখন আপনার জিজ্ঞাসার তৃপ্তি হয়েছিল?

—চেষ্টা করেছিলাম? আপনি এক কাজ করুন। বাড়ী গিয়ে দিনলিপি লিখতে সুরু করুন। কোনও দিন যেন ভুল না হয়। ডায়েরিটি নিজের কাছে রেখে দেবেন। আমার ডায়েরিটি আপনাকে দিচ্ছি। আজ থেকে দু বছর আগের ডায়েরি।

—সেটা শেষ হলে পরে…?

—আপনার জানবার ইচ্ছাটা অতৃপ্তই রাখবেন দু বছর বাদে আবার আসবেন।

—দু বছর বাদে ইচ্ছাটা হয়তো আরও বাড়বে।

—তাহলে আপনি কত বছরের ডায়েরি নিতে চান?

—গতকাল অবধি—গত বছর পর্যন্ত।

—আপনি কত বছরের ভবিষ্যৎ জানতে চান—এক… দুই… চার… ছয়?

—আমাকে দশ বছরের ডায়েরি দিন।

—দশ? অত বছর দিয়ে আপনি কি করবেন? মানুষ তো ভবিষ্যৎ জানতেই পারে না। আমার কথা শুনুন আপনি দুবছরের ডায়েরি নিয়ে যান। ওটার মেয়াদ শেষ হলে পরে আপনি আবার আমার কাছে আসতে পারেন।

—আচ্ছা আপনি সে সময়ে যে ডায়েরিটি পেয়েছিলেন সেটি কত বছরের ছিল?

—দশ বছরের।

—আমি যত বছরের চাইছি আপনিও তো তত বছরের চেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ—কিন্তু ওটাতে একটা শর্ত ছিল।

—আমিও সেই শর্ত মেনে নেব।

—ঠিক আছে।

বাবাসাহেব দশটি ডায়েরি নিয়ে এলেন।

—এর উপরে ক্রমসংখ্যা দিয়ে রেখেছি। দশ বছরের দশটি।

—তাহলে আমি কাল থেকে লিখতে সুরু করব।

—আমি যখন থেকে পেয়েছিলাম, ঠিক তখন থেকেই লিখতে সুরু করে দিয়েছিলাম। আপনিও যদি নিয়মিত লিখতে সুরু করেন, তবে ডায়েরিটি আমার মতই হবে। এবারে শর্তটি বলছি। আপনি প্রথমে আপনার দিনলিপিটি লিখবেন তারপর আমারটি খুলে দেখবেন মিলে গেছে। প্রত্যেকদিনই একই রকম করবেন।

—তাহলে আমার কি লাভ হবে? আমি তো ভবিতব্যের ঘটনা জানতে চাইছি।

—ওটি কিন্তু একেবারেই করবেন না। হ্যাঁ, তাহলে ভবিষ্যৎকে অপমান করা হবে। ভবিষ্যৎ জেনে কেউ সুখী হয় না। কালকে কি হবে এই জিজ্ঞাসা অতৃপ্ত থাকে বলেই জীবনের প্রতিটি দিন মিলে মিশে এগিয়ে যায়। আগামী-কালের জন্য আমাদের আশা থাকে। গতকাল ভাল কেটেছে সে কথা মনে করে আজকের দিনের আগ্রহ থাকে। পঁচিশ বছর বাদে কি হবে সেটা তো আপনি জানতে পারছেন তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন-না। আপনি তো অনেকটাই জানতে পারছেন—এও তো কেউ জানতে পারে না।

—তা হোক, আপনি আমাকে দশ বছরের ডায়েরি দিন।

—আচ্ছা-আচ্ছা দিচ্ছি। দয়া করে ঐ শর্তটি পালন করবেন কিন্তু। আর একটি অনুরোধ। আপনি এই ভাগ্যের শেকলটি ভেঙে দেবেন। আপনার

ভবিষ্যৎ জানবার জন্য যারাই আসবে তাদের আপনি ফিরিয়ে দেবেন। তাদের বলবেন—এটি ঠিক নয়। আপনি আমার এই অনুরোধটা রাখবেন তো?

—নিশ্চয়ই রাখব।

—এটা কিন্তু আমার নিজের স্বার্থের জন্য বলছি না। তবে এই চক্র থেকে কাউকে তো একদিন বেড়িয়ে আসতেই হবে। আমাদের চলার পথটা যেন মাঝ-পথে অস্পষ্ট হয়ে যায়। ওরা যেন নতুন পথ খুঁজে পায়। দয়া করে আমার অনুরোধটা রাখবেন।

...

কোলাপুর থেকে বাড়ী ফিরে এসে ভাউ সাবিত্রীবাঈ-এর কাছে দশটি ডায়েরি গচ্ছিত রাখল। বলল, ভবিতব্যের চাবি পেয়ে গেছি। এখন এটিকে কাজে লাগাতে হবে। বাল্মীকির মতন অষ্টেকর আমার আগামী দশবছরের জীবন লিখে রেখেছে।

—কিন্তু আমার মনে হয়···

—এখন আর কিছু বলে লাভ নেই। আর কোন কথা নয়।

ভাউ সারাদিনের ঘটনাবলী ডায়েরিতে লিখল—তারপর অষ্টেকরের ডায়েরির পাতা খুলল। বাঃ, দুটি পথ একই চক্রে ঘুরছে। ভাউ ডায়েরি লেখার নেশায় মেতে উঠল। অফিস থেকে বাড়ী ফিরে কিছু খেয়ে নিয়ে ডায়েরি লিখতে বসে যায় আর অষ্টেকরের ডায়েরির সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। আজ যা ভাউ-এর চিন্তা-ভাবনা অতীতের এক সময়ে সেটা অষ্টেকরের ছিল। ভাউ-এর আজকের ভয়-ভীতি একদা অষ্টেকরকেও ভোগ করতে হয়েছিল। পঁচিশ বছর আগে অষ্টে-করকেও এরকম ডায়েরি লেখার নেশায় পেয়েছিল।

ভবিতব্যের কথা ভাবতে ভাবতে ভাউ একদিন অফিস থেকে ফিরছিল—মোটর গাড়ীর ধাক্কায় ওর একটা অ্যাক্সিডেণ্ট হল। ভিড় জমে গেল ওকে ঘিরে। ···নানাজন নানারকম কথা বলতে লাগল। ভাউকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া হল।

সাবিত্রীবাঈ এসব দেখে একেবারে ঘাবড়ে গেল। হাসপাতালের বিছানায় ভাউকে দেখে কাঁদতে সুরু করল। বেহুঁশ অবস্থায় ভাউ ভুল বকে চলেছে। আমি মরব না—ডায়েরিতে দেখ··· আমাকে একটা বাংলো বানাতে হবে··· আমার নন্দু, আমার অশোককে মানুষ করতে হবে। জ্ঞান ফিরে এলে ভাউ সাবিত্রী-বাঈকে জিজ্ঞেস করল, ডায়েরি এনেছ?

—না, কালকে আনব।

—ভুলে যেও না যেন। নিশ্চয় করে আনবে কিন্তু। আমি বেঁচে উঠব।

পরের দিন ভাউ দৈনন্দিনী* খুলে দেখল আগের পাতাটা শূন্য। ভাউও লিখতে পারে নি। আট দিন ও ডায়েরি লিখতে পারল না। অষ্টেকরের ডায়েরিতেও ঐ পাতাগুলি ফাঁকা ছিল। নবম দিনে ভাউ নিজের দৈনন্দিন লেখা শেষ করে অষ্টেকরের ডায়েরিটি খুলে দেখল। ওতে লেখা ছিল··· 'গত সপ্তাহে বিকেলের দিকে মৃত্যুর আগমন হয়েছিল—মোটর অ্যাক্সিডেণ্টে আমি মারা যাচ্ছিলাম কিন্তু বেঁচে গেলাম। গত আটদিন হাসপাতালে পড়ে আছি···।

ফাঁকা পাতাগুলির মানে বুঝতে পারল ও।

...

এভাবে এক বছর কেটে গেল। ভাউ আর একটা ডায়েরিতে দৈনন্দিনী লেখা সুরু করল। একদিন বিকেলে ও অফিস থেকে বাড়ী ফিরে এল খুব অন্যমনস্ক-ভাবে। কোন কথাবার্তা না বলে দৈনন্দিনী লিখতে বসে গেল। অনেকক্ষণ ধরে লিখল। লেখা শেষ করার পর অষ্টেকরের ডায়েরিটি সাগ্রহে খুলল।

লেখা ছিল—'আজ হঠাৎ একটা সঙ্কটে পড়লাম। অন্যের অপরাধ আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে। অফিসে পঞ্চাশ হাজার টাকা কেউ চুরি করেছে আর সবাই আমাকে সন্দেহ করছে। আমি তো নিজের নেশাতেই মশগুল হয়ে আছি—কিন্তু লোকেরা ভাবছে অন্যরকম। এই বিপদ থেকে আমাকে মুক্তি পেতে হবে। আজকে অফিসে এই নিয়ে গুজগুজ শুনেছি—কালকে হল্লা হাঙ্গামা হবে কিন্তু আমি নিরপরাধ। একটি পয়সাও আমি নেই নি। তাহলে এই কাজটা কে করল?··· আমার উপর থেকে যেন এই কলঙ্কের বোঝা নেমে যায়।'

'পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি হাতিয়েছি বলে অফিসের লোকেরা আমাকে সন্দেহ করছে—সাবিত্রীবাঈকে ভাউ যখন এই কথাগুলি বলল তখন ও ভীষণ মুষড়ে পড়ল। বাঈ বারবার ভাউকে জিজ্ঞেস করতে লাগল টাকাটা সত্য কে নিয়েছে। পরের দিন আবার অফিসে ঐ একই বিষয় নিয়ে আলোচনা। বড়সাহেব ভাউকে নানাভাবে প্রশ্ন করতে লাগলেন। ভাউ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল যে ও টাকা নেয় নি। কিন্তু ভাউ সম্বন্ধে বড়সাহেবের মনে যে সন্দেহ জন্মেছিল তা দূর হল না। অফিসের প্রত্যেকেই ভাউ-এর দিকে

* দৈনন্দিনী—এটিও মারাঠী শব্দ। ডায়েরি অর্থে।

সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। ভাউ-এর মন ভয়-ভাবনাময় উথাল-পাথাল করতে লাগল।

এদিকে ভাউ রোজ ডায়েরি লিখে চলল—আর পাগলের মত অষ্টেকরের ডায়েরির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে লাগল।

চারদিন···আটদিন···

ভাউকে সাসপেণ্ড করা হল চাকরী থেকে। পুলিশ এনকোয়ারী সুরু হল। মাথার উপরে দুশ্চিন্তার বোঝাটা যখন অসহ্য হয়ে উঠল ভাউ সাবিত্রীকে বলল—'আর নয়। কিছুই তো এগুলো না, গত তিনবছর শুধু ডায়েরির পাতা মেলাতেই কাটল। এবারে আমি আগের পাতাগুলিতে কি আছে অষ্টেকরের ডায়েরি খুলে পড়ে নেব। পঁচিশ বছর বাদে কি হবে তা তো আমি ওকে দেখেই জেনে গেছি। কিন্তু, মাঝখানের বছরগুলি? মাঝের বছরগুলি কেমন কেটেছিল, তখন কি কি ঘটেছিল আমাকে জানতেই হবে। আমি আগের পাতাগুলি পড়ে নেবই। এই বিপদ থেকে অষ্টেকর কিভাবে মুক্তি পেয়েছিল—ঐটুকু জানা অবধি পড়ব। ব্যস।··· আর এই দশবছরের ডায়েরিগুলিতে যদি না লেখা থাকে তবে কোলাপুরে গিয়ে আগের ঘটনাগুলি জেনে নিতে হবে। কিন্তু এভাবে আর থাকা চলে না। যা হবে তা তো হবেই—যাই হোক-না কেন, আমি তা জেনে নেব। আমার সহ্যশক্তি ফুরিয়ে এসেছে। একমাত্র এই একটি পথ আমার সম্বল আমাকে জেনে নিতে হবে, আমাকে ভবিতব্যের পথটি জেনে নিতে হবে।

—তুমি এত চিন্তা করছ কেন? তোমার এ একটা নেশা হয়ে গেছে—অন্যের ডায়েরি খুলে দেখা। পঁচিশ বছর বাদে তো সবই ঠিক হয়ে যাবে। একটু ধৈর্য ধর। তুমি তো কোন দোষ কর নি।—কিন্তু সেটা কি করে প্রমাণ করবে তাই ভাব।

—আমি অতদিন অপেক্ষা করতে পারব না। মৌথিক অঙ্কের মত আমি এর চট্‌জলদি উত্তর চাই। বইয়ের শেষে অঙ্কের উত্তর থাকে—সেই উত্তর মিলিয়ে নিয়ে আমি অঙ্ক করতে চাই। কালকে যদি অফিস থেকে কোন খবর না পাই, তবে ভবিতব্যের গুহার মুখ থেকে পাথর সরিয়ে আমি ভেতরটা দেখে নেব।

ভাউ সারারাত্রি ধরে চিন্তা করল—সকালে উঠে অষ্টেকরের ডায়েরির পাতা খুলে দেখল, —'সারা রাত ভেবেছি। সকাল বেলায় সাহস করে দৈনন্দিনী

খুলেছি—কিন্তু আবার বিবেক চালিত হয়ে বন্ধ করেছি—কিন্তু আগেরটা পড়িনি। ভাউও দৈনন্দিনী বন্ধ করে রাখল। অফিসে যাবার সময় সাবিত্রীকে ডেকে বলল, 'আজকে আমি নিয়ম ভঙ্গ করব···অফিস থেকে যদি কিছু ভাল খবর না পাই তবে আমি বাড়ী ফিরে ডায়েরির সব পাতাগুলো পড়ে ফেলব। কারও কথা শুনব না···।'

ভাউ অফিসে বেরিয়ে গেলে সাবিত্রীবাঈ ভগবানের পায়ে বেশ করে মাথা কুটে দিল—'হে ভগবান, হে ঠাকুর, আমাকে মাপ কোরো' বলে অষ্টেকরের ডায়েরিটি খুলে পড়তে লাগল। সাবিত্রী ওর স্বামীর আগেই ভবিষ্যৎ জানতে চেয়েছিল—কিন্তু পাতা খুলে যা দেখল তাতে সাবিত্রী ভীষণ ভয় পেয়ে গেল।

লেখা ছিল—যার কোন পথ খুঁজে না পেয়ে অষ্টেকর গৃহত্যাগ করেছে। স্টেশনে গিয়ে যে গাড়ী পেয়েছিল তাতেই ও চেপে বসেছিল। চলে গিয়েছিল অনেক দূরে।

আর কয়েকটি পাতার পর লেখা ছিল— 'দিনগুলি কঠিন ভাবে কাটছে। দুদিন ধরে পেটে অন্ন পড়ে নি। কারও কাছে হাত পাতা—সে তো নিজের অপমান···। সাবিত্রী পড়ে বলল, ভবিতব্যের মৃত্তিকা খনন করতে করতে এগিয়ে চলল যতক্ষণ না ভাল দিনের সে সন্ধান পায়। কিন্তু তখনও দুঃখ ভোগের অনেক বাকী ছিল—অপমান গিলে পেট ভরানোর বাকী ছিল—কোথাও আশ্রয় পায় নি—দুঃখের চক্র ঘুরে চলল—ঝড়বৃষ্টি জলকাদার উপর দিয়ে চলতে হবে ···রোদে চলতে গিয়ে পা পোড়াতে হবে··· শীতের দাপটে কাঁপতে হবে··· না, না, ভাউ এসব কি করে সহ্য করবে? এত দুঃখ এত অপমান ও সহ্য করতে পারবে না। আজ আমরা যেখানে এটাই তো দুঃখের শেষ সীমা হওয়া উচিত। তারপর আরও! অসম্ভব।

সাবিত্রীবাঈ নন্দুকে ডাকল। আর ডায়েরিগুলি সব কুয়োতে ফেলে দিতে বলল।

···

বিকেলে ভাউ নিরাশভাবে বাড়ী ফিরে এল। দরজার কাছে জুতো খুলল। সাবিত্রীকে বলল, 'এখনও মাথার উপরে খাড়া ঝুলছে। সব রাস্তা বন্ধ। ডায়েরি-গুলো নিয়ে এসে তো। সেগুলি না পড়ে আমি ছাড়ছি না আজ।'

সাবিত্রীবাঈ মনকে শক্ত করল। নন্দুকে ডাকল। ওকে ভাউ-এর সামনে দাঁড় করিয়ে খুব মারতে সুরু করল।—'অসভ্য! শয়তান ছেলে। ডায়েরি নিয়ে

খেলা! খেলতে খেলতে সবগুলি কুয়োতে ফেলে দিয়েছে।' নন্দু কিছু বলবার চেষ্টা করল কিন্তু মায়ের চোটে কিছু বলতে পারল না।

ভাউ কপাল চাপড়াতে সুরু করল,—এ ছিল আমার ভাগ্যে! এ ভাবেই আমি শেষ হয়ে যাব। আজকে সকালেই দেখলে পারতাম। এখন কি হবে? আমার জন্য আর কি পথ খোলা আছে? এখন আমি কোন দিকে যাই?—ভাউ ঘরের ভেতর পায়চারি সুরু করল। সাবিত্রী তো ভবিষ্যতের গুহার মুখে পাথর চাপা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। এখন সে পাথর সরানো অসম্ভব।

—তুমি কিছু খাবে এস। অত ভাবছ কেন—সব ঠিক হয়ে যাবে। যখন তুমি মোটর চাপা পড়েছিলে তখন আমি যেমন ধৈর্য ধরেছিলাম—এখন তুমি সে রকম ধৈর্য ধর। পঁচিশ বছর বাদে যে ভাল দিনগুলি আসবে তুমি সেদিকে তাকাও। আমি বলছি, দেখো, তুমি একদিন এই সব ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবে। শুধু শুধু কালকে কি হবে জেনে নেওয়াটা ঠিক নয়। এখন কি হবে সেটাই দেখ। রাত্রে সাবিত্রী ভাউ-এর মাথায় তেল ম্যাসেজ করে দিতে লাগল। আরামে ভাউ-এর চোখে ঘুম নেবে এল। সাবিত্রী তখন ঠাকুরের আসনের কাছে এসে বসল। অনেকক্ষণ ধরে ঠাকুরকে মিনতি জানাল।

সকালে সাবিত্রীবাঈ-এর ঘুম ভাঙল। নন্দু পাশে শুয়ে। নন্দুর মাথায় হাত রেখে গতকালের ঘটনার জন্য মনে মনে খুব অনুতপ্ত হল।...ভাউ-এর বিছানার দিকে ঘুরে দেখল সাবিত্রী।

বিছানাটা খালি!

ঘুম

বিজনকুমার ঘোষ

সেদিন কলকাতা ভেসে যাচ্ছিল। শেষ রাতে দু' ঘণ্টার বৃষ্টিতেই রাস্তায় এক হাঁটু জল। সুকুমারের নাইট ডিউটি। বৃষ্টির দিনে সর্দি লাগার ভয়ে সরকারি বাস রাস্তায় বের হয় না। সকালবেলায় জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে কারই বা ভাল লাগে! সুকুমারের বিরক্তি যখন চরমে, তখনই দেবদূতের মত সবুজ রঙের একখানা প্রাইভেট বাস এসে দাঁড়াল।

নাইট ডিউটির সময় সুকুমারের পকেটে একখানা থলে থাকে। বাস থেকে নেমেই বাজার। থলেটা তখন কাজে লাগে। নাহলে চা-টা খেয়ে বাজারে দৌড়োও। এতে বাড়তি পরিশ্রম, সেই সঙ্গে সময় নষ্ট।

প্যান্ট গুটিয়ে কাক-ভেজা হয়ে অনেক কষ্টে যখন বাড়ি পৌছুল তখন প্রায় ন'টা। ওকে দেখেই ছবি বলে উঠল, শিগ্‌গির বাথরুমে যাও, আমি লুঙ্গি গামছা দিচ্ছি।

এরপর সুকুমার সটান বিছানায়। হাতে চায়ের কাপ, সামনে বৃষ্টি ঝরছে, তা ঝরুক যত খুশি। এতক্ষণে সুকুমারের মেজাজ এসেছে। চিন্তা করতে লাগল, আকাশে আর কত জল আছে। সরকার বাড়ির পাঁচিলে তখন থেকে একটা কাক ভিজছে। বেচারা! চড়াই পাখিগুলি আছে মজাসে। খাবার খাও আর ঘুলঘুলিতে বস। সুকুমার হঠাৎ হেই-হেই করে উঠল। ব্যাটারা অতি পাজি! পৃথিবী রসাতলে যাচ্ছে অথচ পিঠে ওঠার কামাই নেই। ঘরে ছেলেপুলে আছে।

এই সময় অর্চনা এসে বলল, মামা, তোমাকে কে ডাকছে।

—কে ডাকছে রে?

—আমি চিনি না।

—আসতে বল।

বছর পঁয়ত্রিশের একটা লোক ঘরে ঢুকল অর্চনার সঙ্গে। এক হাতে দুধের

ক্যান, অন্য হাতে ছাতা। দরদর করে জল পড়ছে ছাতা দিয়ে। গায়ের রং ফরসা। চেনা মুখ। পাড়াতেই থাকে। আলাপ পরিচয় নেই। লোকটি ঘরে ঢুকে প্রথম কথা বলল, আপনি জমি কিনবেন?

সুকুমার অবাক।

—কি করে বুঝলেন আমি জমি কিনতে চাই?

—আপনার বন্ধু প্রিয়তোষের সঙ্গে জমিটা কেনার কথা ছিল। শেষকালে ও পিছিয়ে যায়। তবে বলল, আপনি কিনতে পারেন। তাই এলাম।

সুকুমারের মনে পড়ল, অনেক দিন আগে প্রিয়তোষকে সস্তায় জমিটমি দেখে দিতে বলেছিল বটে। আর কত কাল ভাড়া বাড়িতে থাকবে! প্রিয়তোষ প্রায়ই জমি দেখে বেড়ায়। পছন্দও হয়। তারপর এক সময় পিছিয়ে আসে। বড় খুঁতখুতে স্বভাব। যাক, তবু ওর কথাটা মনে রেখেছে।

—জমিটা কোথায়?

—এই তো কাছেই। চলুন দেখবেন চলুন।

—এখন তো বৃষ্টি।—সুকুমারের মনে হল লোকটা দালাল নাকি? তাহলে তো জিজ্ঞাসা করতে হয়, ক' পার্সেন্ট রেট?

—বৃষ্টিতেই তো সুবিধে। আপনি নিজের চোখে দেখবেন জমিতে জল দাঁড়ায় কিনা।—লোকটা চেয়ার একটু এগিয়ে নিয়ে এল, গলার স্বরটাও নিচু করল: আমি বলছি দাদা জমিটা খুব পরিষ্কার। চার কাঠা। আমার একার নেবার ক্ষমতা নেই। তাই আমি একজন ভাল পার্টনার চাই।

সুকুমারের হাসি পেল।

—কি করে জানলেন আমি ভাল পার্টনার?

—প্রিয়তোষ আমাকে সব বলেছে। ও তো আমারও বন্ধু। চলুন দেখে আসি। আজই বায়না।

জমির কথায় কল্পনা হঠাৎ ঝিলিক দিল। দু' কাঠা জমি, তার ওপর ছবির মত বাড়ি। প্রথমে একতলা—গভর্নমেণ্ট লোন—দোতলা। সারাক্ষণ দক্ষিণের বাতাস। অফিস থেকে ফিরে ইজি চেয়ারে চোখ বুজে শুয়ে থাকা কেবল।

সুকুমারের মাথায় ছাতা, পায়ে গাম বুট। এক একটা মেয়ে আছে পয়লা নজরেই পছন্দ হয়ে যায়। জমিটাও ঠিক তাই। জল দাঁড়ায়নি। একটা নারকোল, একটা নিম গাছ আছে। আয়ত ক্ষেত্র। দুটো ভাগ করলেও বাড়িটা মন্দ হবে না।

সুধীরের মুখে হাসি, দাদা পছন্দ হয়েছে তো?

—তা হয়েছে—সুকুমার ঢোক গিলল: দামটা?

—খুব রিজনেবল—গলার স্বরটা ফের নিচুখাদে নিয়ে এল সুধীর: মাত্র আট হাজার করে কাঠা। বড় রাস্তায় পনেরো। এটা একটু ভিতরে হয়ে ভালই হয়েছে। গাড়িঘোড়ার উৎপাত কম। তাছাড়া গলির মধ্যে বলে কর্পোরেশনের ট্যাক্সও কম পড়বে। হেঁ-হেঁ—

সুকুমার ভেবে দেখল, কথাটা মিথ্যে নয়। জমির দর হু-হু করে বাড়ছে। এই তো মোড়ের জমিটা বিক্রি হল বাইশ করে। বলতে গেলে এটা সস্তাই। তবে একটা কূট প্রশ্ন মনে এল।

—আচ্ছা, প্রিয়তোষ পিছিয়ে গেল কেন?

সুধীরের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, খুব ভুল করল। কারণ কি জানেন, ওই দুটো—

দুটো খাটা পায়খানা পাশাপাশি।

দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসার নেশায় ব্যাপারটা নজরে আসেনি। বাড়ির সামনেই নরক! প্রিয়তোষ ভুল করল কোথায় বোঝা যাচ্ছে না। সুধীর কানের কাছে ফিসফিস করল, ঘাবড়াবেন না দাদা। খাটা পায়খানা আমি তুলে দেবই কথা দিচ্ছি। সি. এম. ডি. এ.-কে নোটিশ দিলে ওরাই ব্যবস্থা করে দেবে। অবশ্য কিছু টাকা দিতে হবে।

—কিন্তু টাকাটা কে দেবে?

—বিমলবাবু আমার পরিচিত, উনিও খাটা পায়খানা বাড়িতে রাখতে চান না। আর ধরুন, বিমলবাবু যদি টাকা না দেন তাহলে আমরা দেব। কি আছে! জমিটা কত সস্তায় হচ্ছে চিন্তা করুন তো?

সুকুমার হেসে ফেলল। সুধীর নাছোড়বান্দা। ভালই, বৃষ্টির দিনে জমিটা হেঁটে হেঁটে ওর কাছে এল। এরপর সুকুমার যে প্রশ্নই তোলে তার উত্তর যেন সুধীরের মুখস্থ। যেমন সুকুমার বলে, আজই বায়না, মুশকিলে পড়লাম—

সুধীর সঙ্গে সঙ্গে আশান করে দেয়, ঠিক আছে, আপনি এক হাজার নিয়ে আসুন, আমি দেড় দিচ্ছি। পরে অ্যাডজাস্ট করলেই হবে।

—জমিটা পরিষ্কার তো?—সুকুমার জিজ্ঞাসা করে।

—আপনাকে বিপদে ফেলব না।—সুধীর একটা হাত ধরে ফেলে: আমি সব খোঁজ নিয়েছি। কিশোরী উকিল এ লাইনে চুল পাকিয়ে ফেলেছে।

আপনি তাঁর মুখ থেকেই শুনবেন। কিন্তু দাদা, আজ বায়না না হলে পার্টি বিগড়ে যাবে—

সুকুমার বলল, কাল আমার অফ ডে, কাল বায়নার ডেট দেখলে হয় না? নাইট ডিউটি দিয়ে এসেছি, আবার রাত্রেও বেরোতে হবে। তাই বলছি—

—না হয় না।—সুধীর কথাটা লুফে নিল : একটু কষ্ট করুন দাদা। আমি অনেক কষ্ট করেছি এর জন্য। কতবার কালীঘাটে গেছি কথা বলতে। এক ভাই রাজি হয় তো আর এক ভাই হয় না। সবাই আবার একসঙ্গে থাকেও না। শুভ কাজ ফেলে রাখতে নেই—

সুকুমার এবার মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করল, ধরুন আমার স্ত্রীর যদি আপত্তি থাকে? তাঁর মতটাও তো নেওয়া চাই।

—বেশ তো, বৌদিকে এনে জমিটা দেখান। আপত্তি থাকলে কিশোরী উকিলের বাড়িতে সেটা বলুন। তবে জানবেন আমি একাই বায়না করে ফেলব। পরে পার্টি খুঁজে নেব ঠিকই।

এরপর আর কোন কথা থাকে না। বৃষ্টিটা একটু ধরে এসেছে। নারকোল গাছটার দিকে আর একবার নজর হেনে বাড়ি চলে এল। সটান রান্নাঘরে।

—তোমাকে এক্ষুণি একটু বেরোতে হবে।

—কেন?—ছবি কাপড়ে হাত মুছল।

—জমিটা দেখে আসি।

ইতিমধ্যে ইস্কুল থেকে নান্টু এসে গেছে। বলল, বাবা, আমিও যাব।

আবার দাদার দেখাদেখি হাদুরও তা বলা চাই। বলল, বাবা আমিও যাব।

বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে। উনুনে ডাল চাপানো রইল। জমিটা কাছেই। তালা টালা দিয়ে ওরা বের হল। এবার সুকুমারের পায়ে গামবুট নেই। ছাতাও নেই।

ছবি অত্যন্ত খুশি হয়ে জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁ গো, জমিটা গণ্ডগোলে নয় তো?

—না না।

—লোকটা কেমন কে জানে! তুমি তো সব জায়গায় ঠকে আস। কষ্টের টাকা—

সুকুমার এসব কথার জবাব দিল না। হাদুকে কোলে নিয়ে ও তখন অন্য জগতে। একটার পর একটা সোপান বেয়ে ক্রমশ ওপরে উঠছে। দেশ ভাগ ও দাঙ্গার পর ওরা এসে উঠেছিল এক জবরদখল কলোনিতে। তখনকার

পরিবেশটাই ছিল আলাদা। এই মানুষই তখন অন্য রকম। দখল করা জমিতে কোন স্বত্ব নেই, অথচ তাই নিয়েই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, মারামারি। দিনের বেলা সীমানা ঠিক হলো তো রাতে দেখা গেল খোঁটা এগিয়ে এসেছে। ঠিক যেন বার্নালের জঙ্গল। এই ভাবে পাঁচ কাঠা হয়ে গেল তিন কাঠা। কলোনিতে জায়গা অটুট রাখতে হলে চাই জোরালো কণ্ঠস্বর আর পেশীবল। সুকুমারদের চার ভাইয়েরই ও দুটো জিনিসের একান্ত অভাব। দাদা একদিন বলল, এ থেকে মুক্তি পেতে হলে তোরা মন দিয়ে লেখাপড়া কর। তারপর পাশ-টাশ করে চাকরি নিয়ে যে যেখানে পারিস চলে যা।

এটা প্রত্যেকেরই মনের কথা। সুকুমার মাঝারি মেরিটের ছাত্র। যারা কলেজে পড়ে তাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। কলেজে পড়া মানেই তো ম্যাট্রিক পাশ। সবচেয়ে কঠিন দরোজা। সুকুমার ভাবে, ও কিছুতেই দরজা দিয়ে ঢুকতে পারবে না। চৌকাঠে বিষম জোরে একটা ধাক্কা খেতেই হবে। আর যদি পাশ করে? সুকুমার ভাবে তাহলে এমন একটা লাফ দেবে, ইলেকট্রিকের তারের কাছাকাছি যেন মাথাটা পৌঁছে যায়। সেই মাঝারি মেরিটের সুকুমার পাশ করল। হ্যাঁ, একবারেই। প্রতিজ্ঞা রাখতে গিয়ে হাসি পেল। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে পাশ করেছে। এর মধ্যে কত গাধা, গরু, ছাগল আছে! বোকার মত লাফ দিতে গেলে বরং ঠ্যাং ভাঙার সম্ভাবনা।

দু'তিনটে গলি পেরিয়ে এসে সুকুমার জমিটার ঠিক মাঝখানে বীরের মত পা রাখল। মুখে হাসি।

—কেমন?

হারের লকেটটা যেন কোথায় খুলে পড়েছে, চারদিকে এমনি সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে ছবি সুখে হাসল। হাসলে ওর গালে টোল পড়ে।

—ভালই তো। এত বৃষ্টি, তবু এক ফোটা জল দাঁড়ায়নি।

—ছাখো একটা নারকোল গাছ, একটা নিম গাছ—

—নিম গাছের হাওয়া খুব ভাল। কিন্তু ও-দুটো কি? সুকুমার একটু থতমত খেল।

—ও কিছু না। সি. এম. ডি. এ.-কে নোটিশ দিলে ওরাই তুলে দেবে।

—দেখো বাপু, বাড়ির সব শো কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে।

—আরে না না। সুধীর খুব কাজের ছেলে। ও ম্যানেজ করবেই গ্যারান্টি দিয়েছে।

কথার মাঝখানে নাণ্টু হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, বাবা, ওই দেখ কচি ডাব, আমি খাব।

হাদুও সঙ্গে সঙ্গে, কচি ডাব, আমি খাব।

ফেরার পথে ছবি বলল, জমিটা একটু ভিতরে হয়ে গেল।

সুকুমারের ঠোঁটে বাঁকা হাসি, আমার তো ইচ্ছে করে গোলপার্কে জমি কিনি। আশি হাজার করে কাঠা। জীবনে ওই দরে কিনতে পারব কখনো?

—তাহলে এটাই ভাল। কর্পোরেশনের ভিতরে তো?

—নিশ্চয়ই।—ঘরের তালা খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করল: তোমার পছন্দ হয়েছে?

ছবির গালে টোল খেয়ে গেল। সুকুমার জানে, এ বড় সুখের চিহ্ন।

বেলা বারোটার মধ্যেই খেয়েদেয়ে বের হল। এখনও মেঘ রয়েছে। মেঘের ভিতর দিয়ে ফিকে রোদ উঁকি মারছে। বিয়ের ষ্টিল আলমারিটা হাতড়ে শ'দুয়েক পাওয়া গেল। ছবি দিল একশো টাকা। পাড়াতেই ব্যাঙ্ক। সাতশো টাকা তুলে সুকুমার ঠিক সময়ে কিশোরী উকিলের বাড়ি এল। বুকটা ধুকপুক করছে। কোন ফেরেব্বাজের পাল্লায় পড়ল না তো? ছবি বলে, তুমি সবটাতেই ঠকে আস। ওদের অফিসের একটা ছেলে, বাড়ি মজিলপুরের ওদিকে। একবার শিয়ালদা সাউথ স্টেশনে বদমাইশদের পাল্লায় পড়ে দুটি সোনার বাট কেনে জমি বেচে। তারপর অনেক আশা নিয়ে যায় গাঁয়ের লবাই স্যাঁকরার কাছে। লবাই বালা দুটো রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে, গো মুর্খ কোথাকার, এ তো পিতল!

সুধীর এখনো আসেনি। বাইরের ঘরে বসে আছে সুকুমার। একটু পরে পান চিবোতে চিবোতে কিশোরী উকিল নামলেন দোতলা থেকে। খুবই বৃদ্ধ। এই বয়সেও কোর্টে যেতে হচ্ছে। আসলে জমি কেনা-বেচায় উনি একজন অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা। পাড়ার লোকজন এসে ধরে তাই কোর্টে যেতে হয়। সুকুমার নমস্কার করে বলল, পাড়ায় আপনার অনেক নাম শুনেছি। এতদিন আলাপ হয়নি। আজ হলো।

কিশোরীবাবু খুব আস্তে কথা বলেন।

—হলো নয়, বলুন হতে চলেছে। তা আপনি কে?

সুকুমার বুঝল, বাঘা উকিল। কথার একটু এদিক-ওদিক হলে ঠোনা

খেতেই হবে। বলল, আমি সুধীরবাবুর জন্যে অপেক্ষা করছি। আজই জমির বায়না আছে।

—অ। বুঝতে পেরেছি।

এখন লোক ভাল কেউ নেই। ভাল সুযোগ এলে সুকুমারের কথা জড়িয়ে যায়। ইতিউতি করে শেষে বলেই ফেলল, জমিটা ভাল তো? আপনার কি মনে হয়?

কিশোরী উকিল চুন মুখে নিলেন, আপাতদৃষ্টে ভাল বলেই মনে হচ্ছে। বায়নার পর বিশ বছর সার্চ করা হবে। সন্দেহ হলে আমিই বারণ করব।

সুকুমার নিশ্চিন্ত হল। সুধীর বলেছে, কিশোরী উকিলের চার্জ একটু বেশি। কিন্তু কাজ নিখুঁত। সেটাই দরকার।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে সুধীর এল ট্যাক্সি নিয়ে। মুখে একটা ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গী। ও ড্রাইভারের পাশে, পিছনের সিটে কিশোরী উকিল আর সুকুমার। সুধীর ক্রমাগত বকবক করে চলেছে।

—জানেন দাদা, জমিটার খোঁজ কিন্তু প্রিয়তোষই দিয়েছিল। শেষে ওই পিছিয়ে গেল। এর জন্যে পস্তাতে হবে বলে রাখছি। কত লোকের নজর আছে জমিটার ওপর তা জানেন? প্রায়ই অফিসের পর কালীঘাটে যেতাম। ভদ্রলোক পুলিশে কাজ করেন। বুঝিয়ে সুজিয়ে, নানারকম গ্যাস ট্যাস দিয়ে ম্যানেজ করেছি—

একথা সুকুমারের কানে একটুও ঢোকে না! ম্যাট্রিকের পর জবরদস্ত বাধা হল বি. এ. পরীক্ষা। আর গ্র্যাজুয়েট না হতে পারলে চাকরির বাজারে চু-চু। দাদা তখনো মা ভাই বোনের সাতজনের সংসারটাকে টেনে নিয়ে চলেছে শামুকের মত। বলেছে, থাক তাহলে কলোনিতেই পড়ে থাক। রাত দিন ঝগড়া কর আর মোড়ের মাথায় পানবিড়ির দোকান দে।

সে সময় কাউকে এম. এ. পড়তে দেখলে সুকুমারের ভিতর শ্রদ্ধাভক্তি উথলে উঠত। ছেলেটা গ্র্যাজুয়েট হয়েই তো ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে! আমি তো যেতে পারব না। সে ক্ষমতা সবার থাকে না। তবু মাঝারি মেরিটে এক দিন সেটাও সম্ভব হল। কি আশ্চর্য, রেজাল্ট নিয়ে ফেরার পথে বুকটা এক ইঞ্চিও ফুলে উঠল না। যেন খুবই মামুলি ব্যাপার। ভেবেছিল, ভেতরটায় কত কি হয়ে যাবে। দূর দূর, ওসব কিছুই হয় না।

আলিপুর জজকোর্ট। জীবনে এই প্রথম এল সুকুমার। চারদিকে হৈ-চৈ।

একটা চালাঘরের তলায় সারি সারি টাইপ রাইটারের খটাখট আওয়াজ। এক-জন টাইপ করছে তো দশ জন হুমড়ি খেয়ে আছে। কালো শাড়ি সাদা ব্লাউজ পরা একটি ফর্সা মেয়ে পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। সুধীর চিমটি কাটল, দেখুন দেখুন মেয়ে উকিল!

বায়নাপত্র আগে থেকেই টাইপ করা ছিল। কিশোরীবাবু পড়তে দিলেন। এ একটা নতুন অভিজ্ঞতা। অধিকাংশই আরবি ফারসী শব্দে। ভুল বানানে। ওর নামটা তিন জায়গায় তিন রকম। বায়নাপত্রে বা দলিলে ভুল বানানে কিছু যায় আসে না। মরুক গে। দুই মাসের টাইম দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কোন গণ্ডগোল বেরুলে মালিককে আড়াই হাজার টাকা ফেরৎ দিতে হবে। বাঃ, ভাল কথা। একটা মজার ব্যাপার, ঢাকুরিয়া নাকি গ্রাম! তাহলে কলকাতা এখনো সুতানটি-গোবিন্দপুর। ওদিকে ভারী গণ্ডগোল। ইতিমধ্যে দলিল পড়া শেষ হয়ে গেছে। সুকুমার ছুটে গেল। দক্ষিণের একটা লোক কেসে হেরে উকিলকে বাবা মা তুলে উদ্ধার করছিল। উকিল বিনীত ভঙ্গীতে দুশো ছাব্বিশ নম্বর ধারায় আর একখানা কেস ঠুকে দিতে চাইছে। তাতে লোকটা আরও ক্ষেপে গিয়ে বলছে, দুশো ছাব্বিশ ধারার ইয়ে মারি—

সুকুমার দাঁত বার করতে যাবে, এমন সময় পেছন থেকে সুধীর জামা ধরে টানল, কি দেখছেন, পার্টি এসে গেছে। আরে কোর্টে ওরকম আকছার হচ্ছে। সেদিন দেখি সুন্দরী মেয়েছেলে নিয়ে দু'জনের মধ্যে লড়াই। হাতে কাজ ছিল না, ঢুকে গেলাম। ফৌজদারি উকিলের জেরা কখনো শুনেছেন? হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায় মাইরি। ঠিক আছে, আপনাকে একদিন নিয়ে যাব—

সুকুমার পার্টির দিকে কড়া চোখে তাকাল। পঞ্চাশের ওপর বয়েস। সুখী চেহারা। লালবাজারে কাজ করে। মা খুবই বুড়ি। সাদা থান। বুড়ির আরও তিন ছেলে আছে বাইরে। রেজেস্ট্রির দিন তারা আসবে। বায়নায় মা আর বড় ছেলের সই থাকলেই যথেষ্ট। সুকুমার এটুকু বুঝল, এদের সাদা মনে কাদা নেই। আর সব সময় লোককে অবিশ্বাস করলে চলে না। এবার তাহলে পৃথিবীর অষ্টম নগরীতে দু'কাঠা জমির মালিক হতে চলেছে। শুধু কি তাই, জমি থেকে দু'কাঠা মাঝের আকাশ, আকাশ থেকে সুদূর নক্ষত্রলোক—যাবতীয় সব কিছুর মালিক এই সুকুমার। কলোনির ছবিটাও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল। বর্ষাকালে এক হাঁটু কাদা, কাঁচা ড্রেন। সন্ধ্যা হলে কেরোসিনের কুপি আর হাজার হাজার

মশা। সেদিনের সেই সুকুমার এখন ক্যালকাটা কর্পোরেশনের মধ্যে দুই কাঠার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে চলেছে।

আণ্ডারওয়ারের গোপন পকেট থেকে সুকুমার সাবধানে এক হাজার টাকা বের করল। সুধীর দেড়। টেবিলের তলায় হাত দিয়ে ভদ্রলোক থুতু সহযোগে গুনে নিচ্ছেন। তখন চোখমুখের চেহারা অন্যরকম।

কালীঘাটের বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াতের ফলে সুধীরের সঙ্গে বেশ খাতির জমে গেছে। বুড়ি পিঠে হাত দিয়ে বলছে, বাবা তোমার বাড়ি হোক, আমি দু'দিন গিয়ে থেকে আসব। চোরের জ্বালায় গাছের একটা নারকেল খেতে পেলুম না বাবা। তা তোমার বাড়ি গিয়ে নারকেল কোরা দিয়ে মোচার ঘণ্ট রাঁধব—

সুধীর খুশি হয়ে বলছে, বেশ তো, বেশ তো।

সুকুমার বুঝল, জীবন শেষ হয়ে আসে, কামনা মরে না। নারকেল কোরা দিয়ে মোচার ঘণ্ট খাবার কামনাই বুড়িকে আরও পাঁচটা বছর টিকিয়ে রাখবে।

ভদ্রলোক তখনো চোখ বড় করে নোট গুনে যাচ্ছেন। সুকুমারের ঘুম পাচ্ছে। কাল রাত্রে বড় খাটনি গেছে। আজও নাইট ডিউটি। ইতিমধ্যে সই-টই হয়ে গেল। ভদ্রলোক পাকা দলিল, দাগ নম্বর, খতিয়ান, পরচা ইত্যাদি কিশোরী উকিলকে দিলেন। গত বিশ বছরের মালিকানা সার্চ হবে। কর্পো-রেশনের ট্যাক্সের রসিদও দেওয়া হল ওই সঙ্গে। ব্যস, এবার একটু চা-টা খাওয়া। বুড়ি রাজি হল না। ডায়াবিটিসের জন্যে কিশোরী উকিল নিলেন চিনি ছাড়া শুধু এক কাপ চা। তাঁর চেম্বারেই পাঠিয়ে দেওয়া হল। সুকুমারদের জন্য এল চা আর রাজভোগ। সুধীর কানের কাছে ফিসফিস করল, এখন যা খরচ হবে সব ফিফটি ফিফটি।

ভদ্রলোক বললেন, একটা দলিলই ভাল। কেন খামাখা উকিলকে টাকা দিতে যাবেন?

সুকুমার বলল, পরে তো দুটো দলিল করতেই হবে। হাঙ্গামা রয়েই গেল।

—তা হোক।—ভদ্রলোক হঠাৎ রেগে উঠলেন: আমি চাই না আমার বাবার জমি বারো ভূতের মধ্যের ভাগ হোক। সুধীরবাবুকে বলেই দিয়েছি, আমি একটা দলিলে বেচব—

ভূত বলায় সুকুমারের ঘুমের চটকা ভেঙে গেল। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল

টেবিলের তলায় সুধীরের চিমটি খেয়ে চুপ করল। যাকগে, কি দরকার! বায়না হয়ে গেছে। ভাবি এখন রেজেষ্ট্রি না করে কোথায় যাবে, তবে বুঝল, বড় বিষম এই সম্পত্তির মায়া। বিক্রি করেও পিছন ফিরে তাকাতে হয়।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে ভদ্রলোক মাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলেন। এরপর সুধীরকে থামায় কার সাধ্যি!

—বুঝলেন দাদা, বাপের জমি বেচে দিচ্ছে, তাই মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। আপনি কথা না বাড়িয়ে ভালই করেছেন। ওঃ, কম পরিশ্রম করেছি! কিচ্ছু ভাববেন না, বাড়ি আমি তুলে দেবই। আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে। কোথায় সস্তায় বালি ইট সিমেণ্ট স্টোনচিপস পাওয়া যায় আমার জানা আছে। মাল আমরা দেব, ফুরনে কাজ করাব, এতে কষ্টিং কম পড়বে—

সুকুমার জিজ্ঞাসা করল, আপনি এখন কোথায় যাবেন?

—আমি? ও হ্যা হ্যা—সুধীর হঠাৎ জড়িয়ে ধরল: ও দাদা, আজ আমার আনন্দের দিন! ভারী আনন্দের দিন! আমি এখন কালীঘাট যাচ্ছি। মানত করেছি, বায়নার দিন পুজো দেব আর রেজেষ্ট্রির দিন জোড়া পাঁঠা। কেউ রুখতে পারবে না—কেউ না—

বেকার রোডে দুপুরের ভারী মেঘের তলায় একটা সবুজ রঙের বাস হালকা মেজাজে এগোচ্ছিল। সুধীর তাই দেখে রয়াল বেঙ্গল ভঙ্গীতে লাফ দিল। সুকুমারও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

আজ একটা বিশেষ দিন। পৃথিবীর অষ্টম নগরীতে নিজের নামে এক টুকরো জমি। কম কথা! সিদ্ধান্ত নিল, স্রেফ কামাই। আজ কিছুতেই আপিস যাবে না। উল্টো দিক থেকে আর একখানা সবুজ বাস এসে স্থির দিয়ে দাঁড়াল। ভিড় তেমন নেই। যাঃ শালা—বলে সুকুমারও সুধীরের কায়দায় লাফ দিল। নাইট ডিউটির পর শরীরের ওপর দিয়ে আজ ঝড় বয়ে গেল। এখন চাই বিশ্রাম। সুধীরের কথা মনে পড়ায় হাসি পেল। এখন পুজো দেবে পরে পাঁঠাবলি। ভাল সেলিব্রেশন। সুধীর হাত ধরে টেনেছিল, চলুন দাদা। সুকুমার কিন্তু উৎসাহ পায়নি। মেঘের তলায় বাসটা হরিণের মত ছুটছে। রেড রোড। বৃষ্টি খেয়ে খেয়ে দু'পাশ আরও সবুজ। কোথাও জল দাঁড়িয়ে গেছে। বাসে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। থামছেও না কেবল ইঞ্জিনের গোঁ-গোঁ আওয়াজ। আবার ডুব দিল সুকুমার।

দু'খানা ঘর দশ বাই দশ, বাথরুম, পায়খানা, খাওয়ার স্পেস। মাস ছয়েক

আগে অফিসে তারাপদর সঙ্গে আলোচনা করেছিল, পঞ্চাশ হাজারেই নাকি নামানো যায়। তারাপদ বেলঘরিয়ায় বাড়ি তুলেছে। ওর অভিজ্ঞতার দাম আছে বৈ কি। এই টাকাটা ও অফিস থেকে লোন হিসেবে পেতে পারে। ব্যাংকের তুলনায় সুদ খুবই কম। সুকুমার এই সময় সুবলদার ওপর কৃতজ্ঞ হল। পিসতুতো ভাই। এই অফিসে চাকরি দেবার মূলে। নাহলে বাঁকুড়া, কি জলপাইগুড়ির কোন গণ্ডগ্রামে মাস্টারি করেই জীবন কাটাতে হত। সেইসব দিনগুলির কথা মনে পড়ে। বি. এ. পাসের পর পুরোদমে হাটাহাটি শুরু করে দিয়েছে। চারদিক থেকে আশ্বাস আর সহানুভূতি, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তা সুবলদার বেসরকারি অফিসের তিন তলার সিঁড়িটা আগাগোড়া শ্বেত পাথরের। দারুণ জাঁকজমক। সুকুমার সাদা পাথরে পা ফেলতে গিয়ে ভাবত, আহা, এই অফিসে যদি একটা দারোয়ানের চাকরি পাই! সুবলদা খুবই উঁচু পদে কাজ করে। তাঁর যুক্তি, তোমাকে নিলে কথা উঠবে। সুকুমারের পাল্টা যুক্তি, আপনি তো অনেককেই চাকরি দিয়েছেন। আর একজনের বেলায় কেনই বা কথা উঠবে?

—তুমি আত্মীয়।

—তাতে কি? অফিসের কাজটা করতে পারি কি না, সেটাই তো দেখার। আত্মীয়তা যদি থাকে সেটা কি অপরাধ?

সুবলদা হেসে ফেলেছে, এখন যাও তো, পরে দেখা যাবে।

হ্যা, শ্বেত পাথরের সিঁড়ি ভেঙে সুকুমার একদিন চাকরি করতে এল। দারোয়ানের চাইতে অনেক বেশি মাইনে। মনে আছে পয়লা দিন মস্ত টাক-ওয়ালা সহকর্মী রমেন মিত্র চা খাইয়েছিল। সুকুমারের বুকে ধুকপুকুনি, কাজটা ঠিকমত পারব তো? সুবলদার বদনাম হবে না তো? আশ্চর্য, চা খাওয়ার মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ধুকপুকুনি ঠাণ্ডা মেরে গেল। বছর তিনেকের মধ্যে স্পেশাল ইনক্রিমেণ্ট আর প্রমোশন। আনন্দের আয়ু বড় জোর তিন মিনিট। কেন যে এমন হয় সুকুমার অবাক হয়ে ভাবে একেক সময়। এর পর যথানিয়মে বিয়ে। ফুটফুটে ছবি ঘরে আসে। কিন্তু একই ব্যাপার। দ্রুত ক্লান্তি ছড়িয়ে পড়ে সর্বাঙ্গে।

হঠাৎ পায়ের নিচ দিয়ে ষ্টিমার চলে গেল। গঙ্গায় এখন ভরা জোয়ার। হাওড়া স্টেশনে সুকুমার আর একটা বাসে উঠল। এটা যাবে ঘুঘুড়ি। মণিকা যখন বিয়ে হয়ে ঘুঘুড়ি গেল, তখন সুকুমারের কি হাসিই যে পেয়েছিল!

—ভাগ্যিস জানা গেল পৃথিবীতে ঘুষুড়ি নামে একটা জায়গা আছে!

—নামে কি আসে যায়!—কপট রাগে ফুঁসে উঠেছে মণিকা: গিয়ে দেখে এসো একবার, গঙ্গার ধারে কত বড় কোয়ার্টার! কি সুন্দর দৃশ্য! চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।

তা শ্যামলবাবু নকুলচাঁদ জুট মিলের চীফ ইঞ্জিনীয়ার, প্রচুর মাইনে, জলের ধার ঘেঁসে কোয়ার্টার তো সুন্দর হবেই। বার কয়েক সুকুমার সেখানে গেছে। হ্যাঁ, সেলিব্রেট করার মত জায়গাই বটে। ঘুষুড়ি নামটা কিন্তু এখন আর তত খারাপ লাগে না।

মিল এলাকার মধ্যেই হলুদ রঙের দোতলা বাড়ি। সেন্ট্রির হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে সুকুমার কড়া নাড়ল। দরজা খুলেই মণিকা অবাক। গালে আঙুল ঠেকিয়ে, ওমা, কি সৌভাগ্য! তারপর কি খবর বল?

বারান্দার বিশাল ডিভানে সুকুমার দেহটাকে সম্পূর্ণ এলিয়ে দিল. সব বলছি। আগে একটু জল। তোমাদের বাচ্চা চাকরটা কোথায়?

—দেশে গেছে। কেন?

—একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে।

—আহা, আমি যেন করে দিতে পারি না!

টেবিলে শূন্য জলের গেলাসটা রেখে সুকুমার মুচকি হাসল, তুমি কত বড় লোকের স্ত্রী, তোমাকে চায়ের কথা বলতে পারি?

—ঢং!

মনে হচ্ছে গত কালের মতই শেষ রাত্রি থেকে অঝোরে নামবে। এখন তারই প্রস্তুতি, জলে মেঘের ছায়া, সাঁই সাঁই বাতাস। শরীর জুড়িয়ে আসে কেবল। কি ভালই যে লাগছে! চা এল। মণিকা ফ্রিজ থেকে অনেকগুলি সন্দেশ বের করে এনেছে। পোর্ট কমিশনারের একটা বড় লঞ্চ চলে গেল ঢেউ দিয়ে। লোক বোঝাই নৌকোটা দুলছে ভীষণ রকম। আহা, মণিকা সারা দিন এই সব দেখে!

মনে পড়ে আশুদার কথা। ভদ্রলোক বছর তিনেক হয় রিটায়ার করেছেন। সুকুমারের সঙ্গে বহু বছর নাইট ডিউটি দিয়েছেন পাশাপাশি। ভদ্রলোক কি একটা পত্রিকায় আর্টিকেল লিখতেন নিয়মিত। আর চান্স পেলেই সহকর্মীদের নিখরচায় জ্ঞান দিতেন। এটা তাঁর অভ্যেস, যেমন মা কালীর গায়ের রং কালো, মহাদেব ফর্সা। আবার শ্রীকৃষ্ণ কালো, রাধা ফর্সা। ভারতের এই চিরন্তন রূপ

পরিকল্পনার মধ্যেও নাকি গভীর অর্থ আছে। ফর্সার সঙ্গে ফর্সা শরীরের মিলনে স্নিগ্ধতার স্বাদ মেলে না। একটা সূক্ষ্ম জ্বালা সঞ্চারিত হতে থাকে। দু'জনের এক জনকে কালো হতেই হবে। মণিকার রং কমলালেবুর মত। সুকুমারের ইস্কুলের বন্ধুরা এক সময় ঠাট্টা করত, ওর গায়ের ঘাম দিয়ে নাকি দোয়াতের কালি তৈরি হয়। সুকুমার জুলজুল চোখে তাকাল।

মণিকা শিকারী বিড়ালের মত চাহনিটাকে থাবায় পুরে নিল। পুরুষরা এই সময় ভারী বোকা হয়ে যায়। তা এখন বোকামিটাও ভাল লাগে। বলল, কিগো মশাই, কি মনে হচ্ছে?

সুকুমারের ভিতর দিয়েও যেন একটা লঞ্চ পাস করে গেল। ঢেউ উঠছে ভীষণ। হাসল, তোমাকে আজ ভারী সুন্দর লাগছে মণিকা!

—আহা, মরে যাই!—মণিকা হাসিটাকে সুন্দর করতে গিয়ে কৃত্রিম করে ফেলল: বাবুর পাত্তাই পাওয়া যায় না। আর বুঝি কেউ সংসার করে না?

—কি করব বল, ভীষণ কাজের চাপ—দোয়াতের কালি কমলালেবুতে সামান্য মাখামাখি হল: ও ভুলে গেছি, জান, আজ কলকাতায় একটা জমি কিনলাম। দু' কাঠা।

—তাই নাকি!

—না মানে এখনো কেনা হয়নি, বায়না হল।

—বাঃ, পুরোদস্তুর সংসারী!

—যা বলেছ। আমার আবার আধাখেঁচড়া ভাল লাগে না।

—বাড়ি কবে তুলবে?

—দেখি।

—আমাকে নিয়ে কয়েকদিন রাখবে তো, না বৌ চটে যাবে?

—এক মাস রেখে দেব।—কমলালেবুর কোয়ার আলতো স্পর্শ।

সেও আরও নিচে নেমে এসেছে। বাতাস উদ্দাম। ঘোলা জল। পোর্ট পুলিশের বিপদ সূচক সাইরেন শোনা যাচ্ছে। আজকের দিনটাই যেন কেমন এলোমেলো। ব্রাশিয়ারের নিচে মণিকার বুকটা আরও ধবধবে। আর কি নরম! সুকুমার প্রবল বেগে মুখটা চেপে ধরল সেখানে। একটা শীতল স্নিগ্ধতা চুঁইয়ে নেমে আসছে শরীরে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই নাইট ডিউটির ঘুম ধেয়ে এল। সুকুমার চট করে ভেবে নিল, সি. এম. ডি. এ. খাটা পায়খানাটা তুলে দেবে তো?

স্রষ্টা, তাঁর নির্মাণ তাঁর নির্বাণ

দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক

আইনস্টাইন তাঁর *The World As I See It* বইয়ের "Society and Personality" নিবন্ধে বলছেন, 'Only the individual can think, and thereby create new values for society, nay, even set up new moral standards to which the life of the community conforms. Without creative, independently thinking and judging personalities the upward development of society is as unthinkable as the development of the individual personality without the nourishing soil of the community.' অনুরূপ প্রসঙ্গে না হলেও কার্ল মার্ক্স্ ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস-এর 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র একটি ঘোষণা এখানে উল্লেখ করছি, যার মধ্যে এঁদের চিন্তার ঐক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে : 'In place of the old bourgeois, with its classes and class antagonisms, we shall have an association society, in which the free development of each is the condition for the free development of all.' এই দুটি উদ্‌ধৃতির উল্লেখ এই কারণে যে এঁরা বস্তুত একইরকমভাবে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ও বিকাশের জন্য ওতপ্রোত সম্পর্কের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেন। ব্যক্তি-মনের স্বাধিকার রক্ষা ও বিকাশের মধ্যেই যে নিহিত সামাজিক অগ্রগতি সেই উচ্চারণে দ্ব্যর্থহীন তাঁদের ঘোষণা। আর আমাদেরও তো অভিজ্ঞতা—সমগ্র সমাজের সামান্য অংশ হয়েও একজন ব্যক্তি হয়ে যান চিন্তায়, তত্ত্বে ও প্রয়োগে পথস্রষ্টা, যেন সমাজের অস্তিত্ব ও নির্যাস তাঁর মধ্যে ; সেই ব্যক্তির কর্মজীবনের মধ্য দিয়ে যেন গোটা সমাজটাই প্রকাশিত ও বিকশিত রূপ নিয়ে ভাবীকালের সামনে মেলে ধরছে বর্তমানের উন্মোচন। সেজন্যই কি সুদূর অতীত থেকে আজকের এই মুহূর্ত অবধি সারসত্তার সম্পূর্ণটাই তাঁর অনায়াস আয়ত্তে ? কী সে প্রেরণা, কী সে বোধ যা ধারণ করে অতীত-বর্তমানের

সত্তা, ভবিষ্যতের প্রাণনা ? এ শুধু আয়ত্তের সাধনাই নয়, এ হল নিজের মধ্যকার টানাপোড়েনের বিশ্লেষণাত্মক উদ্‌ভাস, এর জন্যই কোনো কোনো ব্যক্তিমানুষের মধ্যে সৃজনের তীব্র আততি।

কার্ল মার্কসের আগে পর্যন্ত চিন্তানায়কদের দেখি তাঁরা নানাভাবে মেলে দিয়েছেন জগতের অন্তর্রূপ আর ধাপে-ধাপে এগিয়ে নিয়ে গেছেন সমগ্র সমাজের ধ্যান ও অস্তিত্ব। সমাজের অসাম্য ও অসামঞ্জস্যে তাঁদের ছিল অ-সচেতন সংঘাত। অনেকটা অ-সচেতন ভাবেই তাঁরা পথ করে নিয়েছেন ভবিষ্যের। কিন্তু কার্ল মার্কসে এসে আমরা শুনি সচেতন প্রয়োগ, সেই দার্শনিক অভিজ্ঞ, যা সমাজকে বদলাতে শেখায়। এই যে সচেতন প্রয়োগ, যাকে বলা হয় PRAXIS, সে হল অভিজ্ঞতালব্ধ বোধ, যা আয়ত্ত করেছেন মার্কস তাঁর অসাধারণ বস্তুনিষ্ঠ মননের দ্বারা ; জগতের চেহারাটা উপলব্ধি করেই যিনি থেমে থাকেননি—শ্রেণী-দ্বন্দ্ব ও শ্রেণী-বিলোপের ঐতিহাসিক সত্যে উত্তরণ ঘটিয়ে দিয়েছেন আঠারশ শতকের পরবর্তী দর্শনশাস্ত্রকেই।

Lelio Bass-এর 'Man is... in the most literal sense...not only a social animal but an animal that can be individualised only within society.' (*What kind of Individuality*) এই বক্তব্য সমর্থন করেই বলা যায় ব্যক্তিসীমাবদ্ধ মানুষই সেই স্রষ্টা যিনি ধারণ করেন অতীত, বহন করেন বর্তমান আর প্রসারিত করে দেন ভবিষ্যতের পথনির্দেশ এবং তাঁরই সচেতনা সময়কে ব্যাপ্ত করে সমগ্র সমাজের চেতনায় ছড়িয়ে দেয় PRAXIS-এর অঙ্কুর।

স্রষ্টা মানুষের দ্বন্দ্বটা জানা তাই আবশ্যক হয়ে পড়ে। কী এই দ্বন্দ্ব যা নিয়ত বিক্ষত করে চৈতন্য ; যা মন ও মননের ভেতর থেকে চালিত করে সৃজনের অভীপ্সা ? বস্তুত সৃষ্টির জন্য আকুলিত হৃদয়ের সন্ধানেই স্রষ্টা মানুষ অতিক্রম করে যান সাধারণের গণ্ডী। আর এই খোঁজার কারণেই তাঁর মধ্যে কেবলি কাজ করে এক অতৃপ্তির বোধ। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'যে কথাটি বলিতে চাই বলা হয় নাই' কিংবা 'মনে যে আশা লয়ে এসেছি—হল না হল না হে'। এই নেই-বোধ তাঁকে, স্রষ্টাকে, নিজের সৃষ্টি সম্পর্কেই ঠেলে দেয় সংশয়ে, হতাশায়। যে কাফ্‌কা বলেছিলেন, 'আমার সমগ্র অস্তিত্ব শুধু সাহিত্যের প্রতি সমর্পিত' সেই তিনিই তাঁর বন্ধু মাক্স ব্রডকে বলেন তাঁর সব লেখা নষ্ট করে ফেলতে। সে-সমস্তই নাকি অর্থহীন, অপাঙ্‌ক্তেয়, নেহাৎই মামুলি। নিজেকে বাতিল করার, নিজের সৃষ্টিকেই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়া—এই প্রতিমুহূর্তের দহনই

সৃষ্টির প্রেরণা। নিজের সর্জনে নিজেরই বেদনা-ভারাক্রান্ত-ক্ষতের মধ্যে থাকতে-থাকতে, আঘাতে-আঘাতে স্রষ্টা আরো মহৎ সৃষ্টির দ্বার খুলে ফেলেন মনে-মনে।

এইভাবে দার্শনিক, বিজ্ঞানী, শিল্পী সকলেই পৌঁছে যান নির্মাণের জগতে। নিজের মধ্যের ধ্যানটিকে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে পৌঁছে দেন কীর্তিরূপে, দার্শনিক সিদ্ধান্তে। সমগ্র জীবনচর্যার অভিজ্ঞতালব্ধ বোধের যে ফল—সৃষ্টি—তাই যেন উত্তরকালে ফিকে হয়ে যায়। তাই কি সে-সব পূর্বরাগের অসংগতি উত্তরপর্বে প্রেষিত করে নতুন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা? অসামঞ্জস্যগুলো থেকে নতুনকালের স্রষ্টাকে খুঁজে নিতে হয় প্রবাহ, আরো-নতুন করে খোঁজার প্রক্রিয়ায় গ্রথিত হয়ে আসে আর-এক নবীনের সংযোগ? পুরাতন থেকে বিতত হয়ে আসা নতুনের বোধ, এরই ঘোষণা শুনি প্লেখানভের 'মার্কসবাদের মূল সমস্যা'য়: 'মার্কস যদি হেগেলের অধিকারের দর্শনের সমালোচনা করে ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর বস্তুবাদী ব্যাখ্যার বিশদীকরণ করে থাকেন, তবে তা তিনি করতে পেরেছিলেন শুধু এই কারণে যে হেগেলের দূরকল্পী দর্শন সম্পর্কে ফয়েরবাখ তাঁর সমালোচনা সম্পূর্ণ করেছিলেন।

এইবার আরো এক প্রশ্ন আমাদের সামনে আসে, কোনো সৃষ্টিকর্মে অসংগতি দেখা দেয় কেন? স্রষ্টা তো ভুল জেনে কিছু সৃষ্টি করেন না তবে কেনই-বা প্রয়োজন হয় একটি দার্শনিক অভিজ্ঞার আনুত্রিকতা। অন্যমাত্রায় চালিত করে দেওয়া সামাজিক প্রয়োগ? এর একটি কারণ—জগতের পরিবর্তমানতা, দ্বন্দ্বগুলির ক্রম-বিবর্তন—বদলে-যাওয়া স্থান-কালের সঙ্গে ঐতিহাসিক নিয়মে একটি তত্ত্বের ব্যবহারিক ত্রুটি প্রত্যক্ষ হয়ে পড়া। একজন স্রষ্টার সামান্য জীবনেই তাঁর স্বকীয় চিন্তার ক্রম-বিকাশ ঘটে, তাঁর কাছেই ক্রমশ একটি স্তর থেকে আরেক স্তরে উন্নত হয় তাঁর ভাবনাচিন্তা। দ্বিতীয় কারণ, প্রয়োগগত। এ-প্রসঙ্গে মাও-সে-তুঙের 'প্রয়োগ সম্পর্কে' থেকে একটি উদ্ধৃতি উল্লেখই মনে হয় যথাযথ হবে: 'খাঁটি তত্ত্ব দুনিয়াতে শুধু একটাই আছে। এই তত্ত্ব আহরণ করা হয় বস্তুজগৎ থেকে, বস্তুজগতেই আবার এই তত্ত্বের যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়।' বস্তুজগৎ, অর্থাৎ স্থান-কালে সম্পৃক্ত জাগতিক দ্বন্দ্বগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিচ্ছিন্নতার বিষয়টির সঙ্গে অবশ্য মনোজগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিকেও এইসঙ্গে খেয়াল রাখা প্রয়োজন। একজন স্রষ্টার জীবনে তাঁর তত্ত্বের প্রয়োগ সম্ভব নাও হয়ে উঠতে পারে, সে ক্ষেত্রে ভুল হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক। এমনও হয়, সমগ্র সমাজ তাঁর দার্শনিক-উপলব্ধিকে ঠিক ঠিক ধারণা ক'রে উঠতে পারল না—

প্রয়োগের ক্ষেত্রে তখনও ঘ'টে যেতে পারে গুরুতর ত্রুটি। মিকেলাঞ্জে লোকে তাই বলতে শুনি, 'আমার জ্ঞান অজস্র নির্বোধ ব্যক্তির জন্ম দেবে।' এই-সব নির্বোধেরাই তত্ত্বের অপব্যাখ্যা ক'রে তৈরি করে সংকট। দেশে দেশে আজকের মার্কসবাদীদের সম্বন্ধে এ-কথা তো বলা যায়ই।

কিন্তু, মুখ্যত স্রষ্টার মনে সৃষ্টি ঘিরে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, যে টানাপোড়েন, তারই মধ্যে নিহিত আছে ত্রুটিবিচ্যুতির শিকড়। এলিয়ট যখন "Tradition and Individual Talent"-এ বলেন, "The progress of an artist is a continual self sacrifice, a continual extinction of personality', তখন তাঁর 'নিয়ত ব্যক্তিত্বের নির্বাণ' অন্য শিল্পী, অন্য চিন্তানায়কের কাছে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ নিয়ে আসতে পারে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে, চিন্তনের মধ্য দিয়ে এই জগৎকে দেখা; আরো সত্য ক'রে তার অন্তর্রূপের কাছে পৌঁছনর প্রচেষ্টা হল স্রষ্টার ধ্যান। তাঁর মধ্যে জগতের ধারণাটি তাঁরই মতো ক'রে ফুটবে, তাঁর দেখার অন্তর্দৃষ্টির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠবে, এটা স্বাভাবিক। সাধারণ কতকগুলো ঐক্য বাদ দিলে স্রষ্টার সত্তায় বস্তুজগতের বহিঃপ্রকাশের ভিন্নতা আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' আকাশ জুড়ে ঘনঘোর মেঘ-বৃষ্টি কাউকে বাইরে ছুটিয়ে বেড়ায়—কাউকে আবার ঘরের মধ্যে প্রিয়জন-প্রতীক্ষায় ধূপ-প্রদীপের মধুর আয়োজনে ব্যস্ত রাখে। আবার কখনো একই ব্যক্তির দুই-আমি দুই ভাবে দেখে নেয় বৃষ্টির আসা-যাওয়া, ক্ষণে-ক্ষণে বদলে-যাওয়া মুহূর্তের আসা-যাওয়া তাঁরই চেতনায় চেতনাতীত বোধে।

বস্তুত সামাজিক মানুষের অস্তিত্বের বিপন্নতা বেঁচে থাকার সংকট থেকে স্রষ্টা মানুষ এগিয়ে যান একটি ধাপ। তাঁর শুধু বেঁচে থাকা নয়—বেঁচে ওঠা, বাঁচিয়ে রাখা। অনস্তিত্বের পীড়া, বস্তুজগতের দ্বন্দ্বসম্ভূত আত্মিক সংকট তাঁর মধ্যে খুলে দেয় খুঁজে দেখবার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা। তাই সমস্ত ক্ষয় ও ক্ষতের মধ্যে থেকে, যদিও সত্য 'Production turns an animal to a man, a man to an animal' তথাপি এই সত্যের উপরে আরো সত্য—বোধির চলমানতা স্রষ্টার চেতনাকে ঋদ্ধ ক'রে তাঁর যন্ত্রণার ভাষা হয়ে ওঠে, ব্যক্তি ও সামাজিক বিকাশের অনুসন্ধানে ঠেলে দেয় তাঁর চিন্তাচৈতন্য। সাধারণের ভিতরে থেকে ইতিহাসের প্রবহমানতায় বর্তমানের বিচক্ষণতা ও ভবিষ্যতের দূরদৃষ্টি দিয়ে একজন ব্যক্তি শুধু তার আত্মাকে নয়, সমগ্র সমাজের সম্মিলনকেই চালনা ক'রে নিয়ে যান। একটি মানুষের বীক্ষা হয়ে ওঠে দশটি মানুষের, শতসহস্র মানুষের আশা ও শিক্ষার বাণী।

জগৎকে নিজের মতো ক'রে দেখা যে-কারণেই ভুলের একটা প্রচ্ছন্ন আভাস প্রতিটি সৃষ্টিকর্মেই থেকে যায়, তার পাশাপাশি আরো-এক বিষয়, অধিকাংশের মধ্যে নিজের ভাবনাকে বিস্তৃত ক'রে দেওয়ার চেষ্টায়, সাধারণের চেতনার মানের অবমুখিনতা। অর্থাৎ যখন নিজের মতো ক'রে জাগতিক সম্ভাবনার ব্যাখ্যা, আবার সকলের মতো ক'রে সেই ব্যাখ্যাকে সাধারণের গ্রহণযোগ্য ক'রে তোলার চেষ্টায় নিজেরই চেতনার, চিন্তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া, নিজের 'আমি'-কে দমিত রাখা—এই দুইয়ের টানাপোড়েন—একটি ভবিষ্যৎ ত্রুটির সম্ভাবনাকে গাঢ় ক'রে রাখে। একটি দার্শনিক অভিজ্ঞা যেহেতু প্রয়োগ-ব্যতিরেকী প্রতি-বেশ-বহির্ভূত নিছকই আকস্মিক ধারণার নির্যাস হ'তে পারে না, সেহেতু কালের স্রোত বেয়ে তাকে পেরিয়ে আসতে হয় প্রতিটি মুহূর্ত; প্রতি পলে মুখোমুখি হ'তে হয় যাবতীয় দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার। একই সঙ্গে যিনি চিন্তাশীল ও প্রয়োগকর্তা তাঁকে, তাঁর 'আমি'কে তাই অনেকক্ষেত্রে চিন্তা ও তত্ত্বের ব্যবহারিক দিকের সঙ্গে সমঝোতা ক'রে নিতে হয়। অর্থাৎ এ হল একজন ব্যক্তির মতকে সমগ্রের মতাদর্শ হিসেবে পরিগণিত করার ক্ষেত্রের এক গুরুতর সমস্যা। মতাদর্শের কথা বললে সংগঠনের, ইনসটিটিউশনের, কথা এসে পড়ে অনিবার্যভাবেই, যার ভেতর সম্পৃক্ত ক'রে নিতে হয় নেতৃত্ব ও স্ব-ভাবনা। একজন নেতা ও তাত্ত্বিক, তথা দার্শনিককে তাঁর অভিজ্ঞতা ও বোধের আলোকে সমস্ত প্রতি-ষ্ঠানের মতাদর্শ গড়ে তোলার, পরিচালিত করার মধ্য দিয়ে এক বন্ধুর পথ অতি-ক্রম করতে হয়। সম্পূর্ণতই পুরোনো মতাদর্শকে পর্যুদস্ত করা যেহেতু দুরূপনেয়, সেহেতু তাঁর পক্ষে নিজস্ব প্রতীতি ও বীক্ষা অন্যের মধ্যে মানিয়ে নিতে হয়। স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে তখন ঝাঁপ দিয়ে আসে অতৃপ্তিবোধ। মিশে যায় সৃষ্টির অসংগতি-স্বরূপ স্রষ্টার অতৃপ্তিজনিত যন্ত্রণার সঙ্গে।

বস্তুর মধ্যে স্ব-আরোপিত গুণের সচেতন পদ্ধতির মধ্যেই স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মের অসংগতি নিহিত। স্রষ্টা যে একজন ব্যক্তি, একক সত্তা, সমষ্টির উপরেও তাঁর একলা ক'রে দেখা ভুবনখানিই তাঁর মধ্যে রোপণ ক'রে দেয় ত্রুটিবিচ্যুতির বীজ। নিজের মতো ক'রে দেখার মধ্য দিয়েই তাঁকে জগতের ব্যাখ্যা করতে হয়, আবার সমষ্টির বোধকে ভরসা ক'রেই তাঁকে সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত থাকতে হয়। একাধারে ব্যক্তিত্ব ও সামাজিকতা আরোপ, দুই পরস্পরযুক্ত বৈপরীত্যের আপাত-সম্মি-লনের মাধ্যমে এগিয়ে-চলা গড়ে-তোলা ধ্যানই স্রষ্টার সৃষ্টির সংকটের উৎস। আর-একটু সমস্যার গিঁট খুললে দেখা যাবে সমস্যাটা ব্যক্তির ও সমাজের উভয়ত।

সংকটকালেরই পথ বেয়ে এসেছে, আবার কালেরই পথ বেয়ে তার সংশোধিত বিকাশের পথ মুক্ত হয়েছে। স্রষ্টার বুদ্ধিবৃত্তির উন্নত পর্যায়ের কারণেই যেমন সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত বাঁধুনি থাকে, তেমনি বস্তুজাগতিক (যার সঙ্গে সমাজ, বিজ্ঞান ও রাজনীতি সবই যুক্ত) কারণে তাঁর বোধের প্রসারতার একটা সীমা আছে। যা জানা হয়নি, সেই দিকেই তার অভিমুখ, কিন্তু বহু অজানা অতিক্রম করেও অনেক অজানা থেকে যাবে। আর এখানে, তাঁর সীমাবদ্ধতা, সৃষ্টিকার্যের মধ্যকার ত্রুটির কারণ।

বস্তুর মধ্যে স্ব-আরোপিত গুণের উল্লেখ সম্পর্কে মনে হয় আরো একটু বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। মার্কসের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত 'মানুষের সম্মেলনের বিভিন্ন ধরনের উপরে, অস্তিত্বের সামাজিক অবস্থার উপরে গড়ে ওঠে বিশিষ্ট ও অদ্ভুতভাবে গঠিত ভাবাবেগ, মোহ, চিন্তাপ্রণালী ও জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির গোটা একটি অতিসৌধ'; কিংবা 'পুঁজি'র প্রথম খণ্ডে, 'বহির্জগতের উপরে ক্রিয়া করে এবং তাকে পরিবর্তিত করে মানুষ নিজের প্রকৃতিকে বদলায়'-এর সঙ্গে ঐকমত্য নিয়েও আমরা চলে আসতে পারি একটি অভিজ্ঞানে, যার থেকে বলা যায় ব্যক্তির বোধ ও কর্মকাণ্ডও বস্তুজগতের ওপর ক্রিয়া করে, বস্তুকে গুণান্বিত ক'রে তার মধ্য থেকে বের ক'রে নিতে পারে অন্যতর বোধ। আমরা একটা প্রকল্পে (Hypothesis) পৌঁছে যেতে পারি যে, চিন্তা সত্তারই ফল, বস্তুর অস্তিত্বই মানব চেতনার উৎস। চিন্তার গতিপ্রকৃতি জাগতিক, দ্বন্দ্ব প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ, কিন্তু পূর্বনির্দিষ্ট নয়। চেতনাও বস্তুতে ক্রিয়া করে; এগিয়ে নিয়ে যায়, বিকশিত করে তার দ্বান্দ্বিকতা। বস্তু ও চেতনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই এই পৃথিবী অর্থাৎ সপ্রাণ জগৎ এগিয়ে চলেছে নির্দিষ্ট অভিমুখে। চেতনার উন্নতস্তরে তাই ব্যক্তির ভূমিকাকে আমাদের ইতিহাসের গতিধারায় মেনে চলতে হয়। ব্যক্তির ভূমিকাকেই বিকশিত করে এগিয়ে চলেছে সংগঠন, সমাজ, সভ্যতা শিল্প ও ইতিহাস।

কিন্তু সমষ্টির চেতনার সঙ্গে, প্রয়োগের প্রশ্নে, নিজের চিন্তাকে মেলে দেওয়ার প্রশ্নে এই-যে আত্মবোধের কিছুটা আপস করে নিতে হয়, যাতে করে স্রষ্টার সমগ্রতা ব্যাহত হয়, একে অতিক্রম করা যাবে কিভাবে? সমাজেই যেহেতু এই দ্বন্দ্বের উৎস সেহেতু সামাজিকভাবেই মানবচেতনার বিকাশ ছাড়া সম্ভব নয় ব্যক্তির, তাঁর চিন্তার মুক্তি। সমাজের দ্বন্দ্বগুলির, বৈরীমূলক দ্বন্দ্বগুলিকে, শ্রেণী-সংঘর্ষকে তীব্র করে অরও বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গিকে সমগ্র জনগণেরই চেতনার অংশ

করাটাই তাই আত্মার কাছে স্রষ্টার মুক্তি। সামাজিক দ্বন্দ্বগুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিমনের দ্বন্দ্বগুলিকে বিকশিত করা সম্ভব। আর তাহলেই বাস্তব হয় ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন বিকাশ নয়, ব্যক্তির সামাজিকভাবে পূর্ণ বিকাশ। সামাজিক দ্বন্দ্বগুলির অপসারণের ফলে সামাজিক শ্রেণী বিলোপ, রাষ্ট্র অর্থাৎ আইন-সংবিধান-মিলিটারি ইত্যাদি বৈষম্যগুলির উচ্ছেদ এই বিশ্বের সমগ্র মানবের অখণ্ড আত্মার সঙ্গে যুক্ত করে দেবে ছোটো-ছোটো ব্যক্তিমানুষের আত্মাকে। তা সত্ত্বেও হয়ত কেন, নিশ্চিতই থেকে যাবে ব্যক্তিমনের সঙ্গে সমষ্টিচিন্তার ভেদ। একজন ব্যক্তিই সকলকে অতিক্রম করে নিজেকে অধিকতর বিকশিত করে নেবেন, সামাজিক প্রগতির রথকে দ্রুত চালিত করে দেবেন; কিন্তু সে অখণ্ড বিশ্বমানবের (আত্মার) অংশ হিসাবেই। উল্লেখ্য, এই বিশ্ব-আত্মা হল সমগ্র মানব মনেরই মিলিত সত্তা, চেতনার অখণ্ড অংশের সামগ্রিকতা। ব্যক্তির আত্মার (আত্মবোধ, চেতনা) বিশ্ব-আত্মায় সম্মিলিত হওয়ার পরিণতিতে ব্যক্তির মানিয়ে নেওয়ার প্রশ্নটি সুতরাং অনেকাংশেই লোপ পেয়ে যাবে, কারণ সে আর বিচ্ছিন্ন কোনো সত্তা নয়, থাকবে না ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশের রুদ্ধতা। কেননা ব্যক্তি সেখানে কেবলমাত্র সমষ্টির প্রয়োজনই নয়, ব্যক্তির প্রয়োজনেও সমষ্টি। শ্রমের সামাজিকীকরণের ফলে শ্রম সেখানে আর উদ্বৃত্ত মূল্যের (Surplus value) সৃষ্টি করবে না, উদ্বৃত্ত করবে অবকাশ, সময়। সমাজ ও সমষ্টি তখন খণ্ড মানবসত্তার অখণ্ড সমবায়।

স্রষ্টার মনের অতৃপ্তি, সৃষ্টির আসামঞ্জস্য, এই সব বাস্তব, বস্তু ও চেতনা-সঞ্জাত ঘটনাগুলি থেকে যাবে কিন্তু তা আর সামাজিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে তৈরী করা কোনো ব্যাপার হিসাবে নয়, থেকে যাবে ব্যক্তির আত্মগত-আমি (I in myself) ও অ-আমি (Negative I) উপলব্ধ বোধের প্রকাশ হিসাবে। তাই একজন ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের সবচেয়ে বড়ো অভিজ্ঞানই হল সামাজিক দ্বন্দ্বগুলির সম্পূর্ণ সমীভবন।

BIVAV
Price : Rs. 8.00 July—Sept Reg. No.
Vol. 9 No. 4 Published in October '86 R. N. No. 300 17/76